Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আমিনা ইভা

রোলঃ ২৩১০০১২০০৭১

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আমিনা ইভা

রোলঃ ২৩১০০১২০০৭১

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আমিনা ইভা, আইডিঃ ২৩১০০১২০০৭১ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Amina

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

আমিনা ইভা

আইডিঃ ২৩১০০১২০০৭১

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিচার এর অর্থ ও সংজ্ঞা- 6

বিচার ব্যবস্থার ব্যাখ্যা 7

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থার ধারণা- 8

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থার উৎস- 9

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থায় ন্যায়বিচারের মূলনীতি: কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 11

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা বনাম মানুষ রচিত বিচার ব্যবস্থা - 13

ইসলামে আইনের শাসন ও বিচারিক স্বাধীনতা 14

রাসূল (সা.) এর বিচার ব্যবস্থা 19

আব্বাসী শাসনামলে বিচার ব্যবস্থা 27

আব্বাসীদের পরবর্তী যুগের বিচার ব্যবস্থা 29

উসমানী শাসনামলের বিচার ব্যবস্থা 30

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বিচার ব্যবস্থা 31

ইসলামী ন্যায় বিচার: 31

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচারক - 33

বিচার প্রার্থীর অধিকার- 36

বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা- 37

পাশ্চাত্য বিচারব্যবস্থা- 38

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা ও বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা - 39

ফৌজদারি আইনের - 40

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থায় ফৌজদারি আইন- 41

ইসলামিক ফৌজদারি আইন ও আধুনিক ফৌজদারি আইনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ 42

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থায় :মানবাধিকার - 43

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থায় :নারী অধিকার- 44

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থায় :সংখ্যালঘুদের অধিকার 45
ইসলামিক বিচার ব্যবস্থায়: দুর্বল ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী.....46
সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিচার ব্যবস্থা 46
বিচার ব্যবস্থার শাস্তি 47
ইসলামী শাস্তি ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা.....48
হুদুদ আইন.....50
কিসাস ও দিয়াত আইন.....51
অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা.....53
বর্তমান মুসলিম সমাজে ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা.....53
ইসলামিক বিচার ব্যবস্থার বিকল্প নেই -.....57
উপসংহার.....59

বিচার এর অর্থ ও সংজ্ঞা-

বিচার শব্দের বাংলা অর্থ হলো— ফয়সালা, মীমাংসা, সিদ্ধান্ত, ন্যায়-অন্যায় নিরূপণ এবং বিরোধ নিষ্পত্তি।ইংরেজিতে বিচারকে Justice বা Judgment বলা হয়। আরবি ভাষায় বিচারকে "আল-ক্বাদা" (القضاء) বলা হয়।

ইসলামী পরিভাষায় আল-ক্বাদা বলতে কুরআন, সুন্নাহ এবং শরিয়তের বিধানের আলোকে মানুষের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধের ন্যায়সঙ্গত নিষ্পত্তি করাকে বোঝায়।

অভিধানগত অর্থে বিচার হলো কোনো ঘটনা, আচরণ বা বিরোধকে যুক্তি, প্রমাণ ও আইনের আলোকে বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এছাড়াও সমাজে ন্যায়, সাম্য ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

আইনগত অর্থে বিচার হলো আদালত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন ও প্রমাণের ভিত্তিতে বিরোধ নিষ্পত্তি এবং অপরাধের ক্ষেত্রে দোষী বা নির্দোষ নির্ধারণের কার্যক্রম। বিচার কেবল শাস্তি প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি অধিকার সংরক্ষণ, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রতিকার প্রদান এবং সমাজে ন্যায়ভিত্তিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। একটি সভ্য সমাজে বিচার মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

বিচার ব্যবস্থা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সমষ্টি, যার মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয়, মানুষের অধিকার রক্ষা করা হয় এবং আইন অনুযায়ী বিরোধ ও অপরাধের নিষ্পত্তি করা হয়।

বিচার ব্যবস্থার ব্যাখ্যা

বিচার ব্যবস্থা মানবসভ্যতার অন্যতম প্রাচীন ও অপরিহার্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যা সমাজে ন্যায়, সাম্য এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রধান মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি এমন একটি সংগঠিত প্রক্রিয়া ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, যার মাধ্যমে ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা রাষ্ট্রের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ ও সংঘাতের ন্যায্য নিষ্পত্তি করা হয় এবং আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রতিকার ও শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। একটি রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং নাগরিক অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষ সামাজিক জীব হওয়ায় পারস্পরিক সম্পর্ক, স্বার্থ ও কর্মকাণ্ডের ফলে বিভিন্ন সময়ে মতবিরোধ ও বিরোধের সৃষ্টি হয়। এসব বিরোধ যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে নিষ্পত্তি না হয়, তবে সমাজে অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা এবং অন্যায়ের প্রসার ঘটতে পারে। বিচার ব্যবস্থা এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলার মাধ্যমে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করে এবং জনগণের মধ্যে ন্যায়বিচারের অনুভূতি জাগ্রত করে। ফলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয়।

বিচার ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো নিরপেক্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং আইনের সমান প্রয়োগ। একটি কার্যকর বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে যে কোনো ব্যক্তি তার সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক অবস্থান, রাজনৈতিক পরিচয় বা ব্যক্তিগত প্রভাবের কারণে বিশেষ সুবিধা বা বৈষম্যের শিকার হবে না। বরং প্রত্যেক নাগরিক আইনসম্মত অধিকার ভোগ করবে এবং প্রয়োজনে আইনের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ পাবে। এভাবেই বিচার ব্যবস্থা সমাজে ন্যায় ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

বিচার ব্যবস্থা কেবল বিরোধ নিষ্পত্তির একটি প্রক্রিয়া নয়; বরং এটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন, মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি অপরিহার্য উপায়। একটি স্বাধীন, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক বিচার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন এবং নাগরিক কল্যাণ নিশ্চিত করার অন্যতম পূর্বশর্ত।

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থার ধারণা-

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা বলতে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ও নীতিভিত্তিক বিচারিক কাঠামোকে বোঝায়, যা কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামী শরিয়তের বিধানসমূহের উপর ভিত্তি করে গঠিত। এটি একটি ন্যায়নিষ্ঠ, নৈতিক ও আইনি ব্যবস্থা, যার মূল লক্ষ্য হলো সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং অন্যায়-অবিচার প্রতিরোধ করা। আরো সংক্ষেপে বলা যায়, মানুষের পারস্পরিক বিবাদ বিসংবাদের মীমাংসা করার নাম বিচার তবে মীমাংসাটি ইসলামী বিধি সম্মত হলে তবেই সেটিকে ইসলামী বিচার বলা হবে। ইসলামিক দৃষ্টিতে বিচার ব্যবস্থা কেবল আইন প্রয়োগ বা শাস্তি প্রদানের মাধ্যম নয়; বরং এটি একটি ইবাদতসম অর্থবহ দায়িত্ব, যেখানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা ধর্মীয় ও সামাজিক উভয় দিক থেকেই বাধ্যতামূলক। ইসলামে বিচারকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, কারণ ন্যায়বিচার ছাড়া সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব নয়।

*ইসলামিক বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি- আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান।

*ইসলামিক বিচার ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য -

ন্যায়পরায়ণতা, নিরপেক্ষতা, জবাবদিহিতা এবং আইনের শাসন। এখানে সকল মানুষ সমান এবং কারও প্রতি কোনো বৈষম্য করার সুযোগ নেই। বিচারককে অবশ্যই সত্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিতে হয় এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা সামাজিক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে হয়।

*ইসলামিক বিচার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য -

সমাজে সর্বত্র ইনসাফ কায়েম করা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠান করা। যাতে সমাজে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা মাধ্যমে মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারে এবং তাদের জীবনকে আল্লাহর ইচ্ছার অনুকূলে পরিচালনা করা সম্ভব হয়।

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থার উৎস-

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা আল্লাহ প্রদত্ত বিধান ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাস্তব জীবনাচারের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ।এর মৌলিক উৎসসমূহ মানবীয় অনুমান বা পরিবর্তনশীল মতাদর্শ নয়। এই উৎসসমূহ একদিকে যেমন বিচার ব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব ও নীতিগত দৃঢ়তা প্রদান করে, তেমনি সময় ও সমাজের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সমাধান দেওয়ার সক্ষমতাও নিশ্চিত করে।

১. কুরআন: মৌলিক ও সর্বোচ্চ উৎস

পবিত্র কুরআন ইসলামিক বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ উৎস। এতে বিচারকার্যে ন্যায়, সত্য ও নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:
“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তাদের হকদারদের কাছে পৌঁছে দাও এবং যখন মানুষের মধ্যে বিচার করো, তখন ন্যায়বিচারসহ বিচার করো।” (সূরা আন-নিসা: ৫৮)
এছাড়াও তিনি বলেন:
“হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য প্রদান করো, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়।” (সূরা আন-নিসা: ১৩৫)

২. সুন্নাহ: বাস্তব প্রয়োগের দিকনির্দেশনা

সুন্নাহ হলো নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর কথা, কাজ ও নীরব সম্মতির সমষ্টি, যা কুরআনের বিধানসমূহের বাস্তব প্রয়োগের দিকনির্দেশনা প্রদান করে। বিচার ব্যবস্থায় সুন্নাহ কেবল ব্যাখ্যামূলক উৎস নয়; বরং এটি ন্যায়বিচারের জীবন্ত ও বাস্তব উদাহরণ।
নবী (সা.) ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে কঠোর সমতার নীতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলেন:

“তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে, কারণ তারা দুর্বলদের ক্ষেত্রে শাস্তি প্রয়োগ করত, কিন্তু প্রভাবশালীদের ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখাত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, আমি তার হাত কেটে দিতাম।”
(সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

৩. ইজমা: সম্মিলিত জ্ঞান ও নীতিগত ঐকমত্য

ইজমা হলো মুজতাহিদ আলিমগণদের সর্বসম্মত মতামত, যা কুরআন ও সুন্নাহতে সরাসরি উল্লেখ না থাকা বিষয়ে সমাধান প্রদান করে। এটি ইসলামী বিচার ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী, গতিশীল এবং বাস্তবসম্মত রাখে। আল্লাহ তাআলা বলেন:
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী, তাদেরও।”(সূরা আন-নিসা: ৫৯)

৪. কিয়াস: যুক্তিনির্ভর সমাধান প্রক্রিয়া

কিয়াস হলো বিদ্যমান শরঈ বিধানের সাথে তুলনা করে নতুন সমস্যার সমাধান নির্ধারণের যুক্তিভিত্তিক পদ্ধতি। যখন কোনো বিষয়ে সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমার নির্দেশনা পাওয়া যায় না, তখন সাদৃশ্যপূর্ণ কারণ ও নীতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থায় ন্যায়বিচারের মূলনীতি: কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা একটি পূর্ণাঙ্গ নৈতিক ও আইনগত কাঠামো, যার মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, অধিকার সংরক্ষণ এবং অন্যায় প্রতিরোধ করা। ইসলামে ন্যায়বিচার শুধুমাত্র একটি আইনি ধারণা নয়; বরং এটি একটি ঈমানী দায়িত্ব ও আল্লাহর নির্দেশিত অপরিহার্য নীতি। কুরআন ও সুন্নাহ ন্যায়বিচারের এমন মৌলিক নীতিমালা প্রদান করেছে, যা ইসলামিক বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

১. সর্বজনীন ন্যায়বিচার ও নিরপেক্ষতা;

ইসলামে বিচার সকল মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য, কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণির প্রতি এতে ভিন্নতা নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন:
“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করো, তখন ন্যায়বিচারসহ বিচার করো।” (সূরা আন-নিসা: ৫৮)
বিচার ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি হলো নিরপেক্ষতা ও ইনসাফ, যেখানে ব্যক্তিগত প্রভাব বা পক্ষপাতিত্বের কোনো স্থান নেই।

২. সাক্ষ্য ও প্রমাণে সততা;

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সত্য সাক্ষ্য প্রদান অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলা বলেন:
“তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো এবং আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য দাও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়।” (সূরা আন-নিসা: ১৩৫)
এই আয়াত বিচার প্রক্রিয়ায় সত্য ও সততার গুরুত্বকে অত্যন্ত শক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করে।

৩. আইনে সমতা;

ইসলামে সকল মানুষ আইনের দৃষ্টিতে সমান। নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেন:

“তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে, কারণ তারা দুর্বলদের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ করত, কিন্তু প্রভাবশালীদের ক্ষেত্রে ছাড় দিত।” (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)
বিচার ব্যবস্থায় বৈষম্য সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এবং সকলের জন্য একই আইন প্রযোজ্য।

৪. পক্ষপাতহীন ও কঠোর ন্যায়নীতি;

নবী (সা.) ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে কঠোর নিরপেক্ষতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন:
“যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, আমি তার হাত কেটে দিতাম।” (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)
ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পর্কের ঊর্ধ্বে উঠে ন্যায় প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত নীতিকে তুলে ধরে।

৫. দ্রুত ও কার্যকর বিচার;

ইসলামে বিলম্বিত বিচারকে অন্যায়ের একটি রূপ হিসেবে দেখা হয়, কারণ এতে ভুক্তভোগীর অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নবী (সা.) বিচারকার্যে দ্রুততা ও স্বচ্ছতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, যাতে মানুষের অধিকার সময়মতো প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬. মানবাধিকার সংরক্ষণ;

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা মানুষের জীবন, সম্পদ, সম্মান ও ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। কুরআন ও সুন্নাহতে এসব অধিকার রক্ষার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে, যা বিচার ব্যবস্থার মানবিক দিককে শক্তিশালী করে।

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা বনাম মানুষ রচিত বিচার ব্যবস্থা -

১)ইসলামী আইন ব্যবস্থা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এবং মানব রচিত আইন মানুষের মেধা থেকে উৎসারিত।

২)আল্লাহর আইনের পরিধি ব্যাপক কেননা আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক ,ব্যক্তির নিজের সাথে তার সম্পর্ক এবং সমাজের অপরাপর মানুষের সাথে তার সম্পর্কের বিধি-বিধান বর্ণনা করে ।অপরদিকে মানব রচিত আইন শুধুমাত্র সমাজের অপরাপর মানুষের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্ণনা করে।

৩)আল্লাহর আইন বাহ্যিক কর্মের সাথে যেমন সংশ্লিষ্ট ঠিক তেমনি উদ্দেশ্যের সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট কিন্তু মানব রচিত আইন বাহ্যিক বিষয়ের সাথেই সম্পর্কিত।

৪)আল্লাহর আইন অমান্য করলে দুনিয়ায় যেমন শাস্তির বিধান রয়েছে ,তেমনি আখেরাতে শাস্তির বিষয়টিও রয়েছে কিন্তু মানব রচিত আইন অমান্য করলে শুধু দুনিয়াতে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

৫)আল্লাহর আইনের মাঝে তা মেনে চলার অনুপ্রেরণাদায়ক শক্তি বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু মানব রচিত আইনে শুধু আইনের শাস্তির ভয় ছাড়া কিছুই নেই।

৬)মানব রচিত আইন ত্রুটিযুক্ত কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত আইন ত্রুটিমুক্ত।

আল্লাহর বিধানের আলোকে বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করলে সেই সমাজের মানুষ সর্বোচ্চ মাত্রায় জান-মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা লাভ করে অপরদিকে মানুষের তৈরি আইনে মানুষের ব্যক্তিগত খেয়াল খুশি ও ইচ্ছার প্রবৃত্ত দ্বারা বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত করা হয়েছে যা মানুষের উপর জুলুম নির্যাতন স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বৈরাচারিতা হয়েছে।

ইসলামে আইনের শাসন ও বিচারিক স্বাধীনতা

ইসলামে আইনের শাসন ও বিচারিক স্বাধীনতা একটি মৌলিক নীতি, যা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং সমাজে ভারসাম্য রক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা এমন একটি আদর্শ কাঠামো উপস্থাপন করে, যেখানে সকল ব্যক্তি, শাসক থেকে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত, আল্লাহর আইন ও শরিয়াহর বিধানের অধীন।

১. ইসলামে আইনের শাসনের ধারণা

ইসলামে আইনের শাসন বলতে বোঝায়—সমাজের সকল ব্যক্তি সমানভাবে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান (শরিয়াহ) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী, তাদেরও।”(সূরা আন-নিসা: ৫৯)
শাসক ও শাসিত উভয়েই আল্লাহর বিধানের অধীন। অর্থাৎ আইন সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।
আরও বলা হয়েছে:
“তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য দাও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে যায়।”
(সূরা আন-নিসা: ১৩৫)।

২. নবী (সা.)-এর যুগে আইনের শাসন

নবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁর শাসনামলে আইনের শাসনের বাস্তব উদাহরণ স্থাপন করেন। তিনি নিজ পরিবার ও সাধারণ জনগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য না রেখে বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। তিনি বলেন:
“যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।”
(সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

এই হাদিস ইসলামে আইনের শাসনের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত, যেখানে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা সামাজিক অবস্থান আইনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে না।

৩. বিচারিক স্বাধীনতার ধারণা

ইসলামে বিচারিক স্বাধীনতা বলতে বোঝায়—বিচারক কোনো রাজনৈতিক, সামাজিক বা ব্যক্তিগত চাপের অধীন না থেকে কেবল কুরআন, সুন্নাহ এবং প্রমাণের ভিত্তিতে রায় প্রদান করবেন। বিচারককে তার সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হলেও তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।
নবী (সা.) বিচারকদের নির্দেশ দিয়ে বলেন:
“তুমি যখন বিচার করবে, তখন কুরআন অনুযায়ী বিচার করো; যদি সেখানে না পাও, তবে সুন্নাহ অনুযায়ী; আর যদি সেখানে না পাও, তবে তোমার ইজতিহাদ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো।”(আবু দাউদ, তিরমিজি)

৪. বিচারিক স্বাধীনতার বাস্তব প্রয়োগ

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে বিচারকদের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছিল। বিশেষ করে উমার ইবনে আল খাত্তাব বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে পৃথক করেন এবং বিচারকদের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ না করার নীতি প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা ও স্বচ্ছতা আরও সুদৃঢ় হয়।

ইসলামে আইনের শাসন ও বিচারিক স্বাধীনতা একটি অবিচ্ছেদ্য নীতি, যা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল ব্যক্তি আইনের অধীন এবং বিচারকগণ স্বাধীনভাবে ন্যায়ভিত্তিক সিদ্ধান্ত প্রদান করতে বাধ্য। এই নীতির মাধ্যমে ইসলাম একটি ন্যায়নিষ্ঠ, সমতাভিত্তিক ও মানবিক বিচার ব্যবস্থার আদর্শ উপস্থাপন করেছে।

#বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস -

বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসকে বিশ্লেষণের জন্য চারটি যুগকে আলাদা করতে পারি :

১)মানবজাতির সূচনাকাল থেকে তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বযুগ পর্যন্ত।

২)তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে হযরত ঈসা (আ.) এর যুগের সমাপ্তি পর্যন্ত।

৩)জাহেলী যুগ অর্থাৎ তাওরা ও ইঞ্জিলের পরবর্তীকাল থেকে ইসলামের অভ্যুদয় কাল পর্যন্ত।

৪)ইসলামের অভ্যুদয় কাল থেকে আজ অব্দি ।

শুরু থেকেই কোন কোন জনপদের বিচার ব্যবস্থা আসমানী-দ্বীনি বিধি-বিধানের আলোকে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর কোন কোন জনপদের বিচার ব্যবস্থা গোত্রপ্রধান ,সমাজপতি অথবা রাষ্ট্রপ্রধানের স্বৈরতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কিংবা মানব রচিত আইনের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে।

কুরআন থেকে জানা যায় যে প্রাচীনকালে লোকমান হাকিমের সম্রাজ্যে ন্যায় ভিত্তিক ইনসাফ পূর্ণ বিচার ব্যবস্থা যেমন বিদ্যমান ছিল, ঠিক তেমনি একই সম্রাজ্যের স্বল্প ব্যবধানে সাদ্দামের শাসনব্যবস্থা ও স্বৈরতান্ত্রিক বিচার ব্যবস্থাও বিদ্যমান ছিল।

হযরত নূহ (আ.) এর পূর্বকাল সময়ে উম্মতদের মাঝে তাওহীদকে অস্বীকার ও আল্লাহর নাফরমানীর মানসিকতা বলতে গেলে ছিলই না। যে কারণে সে সময়ে আসমানী বিষয়সমূহের অর্থাৎ তাওহীদ, ইবাদাত, আখেরাত তথা ঈমান সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনার তেমন প্রয়োজন ছিল না। বরং মানুষের জীবন জীবিকার পন্থা ও পদ্ধতির বিষয়ে আলোচনার করার প্রয়োজন ছিল অধিক।

হযরত নূহ আলাইহিস সাল্লাম এর সময়কাল থেকে আল্লাহকে অস্বীকার করা, শিরকে লিপ্ত হওয়া এবং ইবাদতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ও আখেরাতের অস্বীকৃতির প্রবণতা ব্যাপকতা লাভ করে ।সঠিক ও বিশুদ্ধ আক্বীদা পেশ করে মানুষকে শিরক ও কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্য তখনকার ওহীর দিকনির্দেশনায় ওইসব বিষয়েই প্রাধান্য পেয়েছে।

তাওরাত যখন অবতীর্ণ হয় তখন মানুষ জীবন জগতের বিস্তীর্ণ অধ্যায় প্রবেশ করতে শুরু করে। মানুষ অধিকতর সমাজবদ্ধ জীবের প্রতি ছিল অগ্রসমান। সংবদ্ধ জীবনের বিপুল কর্মকাণ্ডের জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল একটি শরীয়ত বা জীবন ব্যবস্থার। আরো

প্রয়োজন ছিল বিধি-বিধান অমান্যকারীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য অধিকতর কার্যকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

আল কুরআনে বলা হয়েছে," আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি এতে রয়েছে জীবন পথের দিক নির্দেশ ও হেদায়েতের নূর যাতে তার আলোকে নবীগণ বিচার ফয়সালা করে।"

আল্লাহর দ্বীনের প্রতি অনুগত মানুষের আনুপাতিক হার ছিল খুবই কম। কেবল নবী ও তার অনুসারীরে দ্বীনের প্রতি অনুগত থাকতেন আর অধিকাংশ মানুষ গোমরাহীর আবর্তে নিমজ্জিত ছিল। তারা বরং নিজেদের ইচ্ছা ও চাহিদা অনুসরণ করে চলতো। অনেক ক্ষেত্রে নিজেরা রচনা করে সেটাকে আল্লাহর বিধান বলে চালিয়ে দিত। নবীদের আনিত বিধি-বিধান বর্জন করে ,মানুষ যে বিধি-বিধান তৈরি করে তার ভিত্তি ছিল লোকপ্রথা, সামাজিক আচার আচরণ, নিজেদের বিশ্বাস ও চিন্তা ভাবনা, জীবন সংকট ও তা সমাধানের ভাবনা।

জাহিলি যুগের আইন ও বিচার ব্যবস্থা আরো নড়বড়ে ও ভিত্তিহীন ছিল। কেননা এ সময়ে মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল :

১)আহলে কিতাব; তারা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের মানসিকতার আলোকে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত বিধি-বিধান নিজেদের চাহিদা অনুকূলে পরিচালিত করেছে। ফলে সেগুলো আত্মনিরপেক্ষতা হারিয়ে ইনসাফ প্রতিষ্ঠান করতে ব্যর্থ হয়েছে।

২) যাদের কোন কিতাব ছিল না; এরা ছিল একান্তই প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির পূজারী ।এদের অধিকাংশ আইন ছিল মনগড়া। মানব প্রকৃতির গভীর ভাবনায় তারা প্রবেশ করেনি। বৃহত্তর সমাজ-সভ্যতা শিল্পকারীদেরই অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ,আন্তর্জাতিক বিরোধ ও বিবাদের নিষ্পত্তির চিন্তাভাবনায় তাদের আইনে ছিল অনুপস্থিত। এ সমাজে ধনী ও সম্ভ্রান্তদের জন্য এক ধরনের আইন ছিল আর গরিব ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষের জন্য ভিন্ন ধরনের আইন ছিল।

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মানব রচিত বিধিবদ্ধ আইন প্রণীত হয় হামরাভী সম্প্রদায় কর্তৃক। বিচার সংক্রান্ত বিধি-বিধান আইন কে সুধীরকরণ ও তা বিধিবদ্ধকরণ এর ক্ষেত্রে হামরাভী ও মিশরীয়রাই ছিল অগ্রগামী। গ্রিক ও রোমানরা অনেক পরে এ সংক্রান্ত জ্ঞান আরোহন করেছে। হামরাভী সম্প্রদায়ের আইনে ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং

প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির অপরাধ করলে সাধারন মানুষের তুলনায় তাকে তিনগুণ বেশি শাস্তি প্রদান করা হতো।

গ্রিক ও রুম কে আইনের জন্মদাতা মনে করা হলেও তাদের রচিত আইন যথেষ্ট ত্রুটিযুক্ত ছিল। এ আইনে দীর্ঘকাল লোকপ্রথা ও স্বৈরাচারী শাসক শ্রেণীর সিদ্ধান্তেই আইন উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

বিভিন্ন কারণে মানুষ তার অভিজ্ঞতা ও মেধার আলোকে আইন প্রণয়ন করলেও ভারসাম্যপূর্ণ আইন ও আত্মনিরপেক্ষ আইন তৈরি করতে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে । ফলে মানব রচিত আইনের মাধ্যমে প্রকৃত ইনসাফ কায়েম করা সম্ভব হয়নি। মানুষ সে আইনের মাধ্যমে জান-মাল ও ইজ্জতের কাঙ্ক্ষিত নিরাপত্তা লাভ করতে পারেনি।

ইসলামের পূর্বযুগে গোটা আরব উপদ্বীপে কোন প্রকার রাষ্ট্রব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল না। তারা বিভিন্ন বিচারকার্য সম্পাদন করতো তাদের পূর্বপুরুষ হতে বংশানুক্রমিকভাবে যে সকল প্রথা ও প্রচলন ছিল তার আলোকে। তারা বিচার করত সীমালংঘন জাতীয় ঘটনার। যেসব ঘটনা ঘটতো, নগরপ্রধান কিংবা গোত্রপতি রায় তার বিচার সম্পাদনা করত আর এই বিচার সম্পাদনের নীতি হতো তাদের পূর্ব প্রকাশ কর্তৃক হয়ে আসা প্রচলন পদ্ধতি। বিচার কার্য সমাধান করার জন্য তারা একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসতো যেমন মক্কার 'দারুল নদওয়ায়' কিংবা কোন উপাসনালয়ের অথবা প্রশস্ত আঙিনা বিশিষ্ট কোন বাড়িতে। তারা ঐ ব্যক্তিকে বিচারক বানাতো যাকে তাদের দৃষ্টিতে নিরপেক্ষ ও ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট না থাকে এমন ব্যক্তিকে মনে হতো। বিচারকরা বিচারকালে উভয়পক্ষ যাতে তাদের বিচার মেনে নিতে বাধ্য থাকে এজন্য শর্ত আরোপ করত কিংবা তাদেরকে বলে দিত যদি কোন পক্ষ পরে বিচার মানতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে সে পক্ষের জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে।

রাসূল (সা.) এর বিচার ব্যবস্থা

ইতিহাসে মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম, ন্যায়ভিত্তিক এবং ভারসাম্যপূর্ণ বিচার ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী বিচার ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াতকাল এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে এই বিচার ব্যবস্থা পূর্ণতা লাভ করে। এখানে ন্যায়বিচার, সমতা, মানবাধিকার এবং আল্লাহভীতিকে বিচার ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র অপরাধীর শাস্তি প্রদান নয়, বরং সমাজে ন্যায়, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো আল-কুরআন ও সুন্নাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন—

“কখনোই না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের বিরোধপূর্ণ বিষয়ে তোমাকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করবে, অতঃপর তুমি যে ফয়সালা করবে তা তারা নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা ছাড়াই মেনে নেবে এবং পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করবে।”(সূরা নিসা: ৬৫)

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, রাসূল ﷺ-এর বিচারকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করা ঈমানের অপরিহার্য অংশ।

*রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান বিচারক। তাঁর বিচার ব্যবস্থার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো—

১) মসজিদভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা;

তৎকালীন সময়ে বিচার কার্য সাধারণত মসজিদে সম্পন্ন হতো, যেখানে সকল নাগরিক সমানভাবে উপস্থিত থাকতে পারত।

২) দ্রুত ও কার্যকর বিচার;

বাদী অভিযোগ করার পর বিবাদীকে দ্রুত হাজির করা হতো এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ রায় প্রদান করা হতো।

৩) ন্যায় ও নিরপেক্ষতা;

রাসূল ﷺ বিচারকের ভূমিকায় কোনো পক্ষপাতিত্ব করতেন না। ধনী-গরিব, শক্তিশালী-দুর্বল—সবার জন্য একই আইন প্রযোজ্য ছিল।

ইসলামী অপরাধসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—
হক্কুল্লাহ: আল্লাহর অধিকার সম্পর্কিত বিষয় (ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় বিষয়)।
হক্কুল ইবাদ: মানুষের পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কিত বিষয়।
হক্কুল্লাহ বিষয়ে কঠোরতা থাকলেও, ক্ষমা ও সংশোধনের সুযোগ থাকলে তা বিবেচনা করা হতো।

*রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের বিচারিক দৃষ্টান্ত-

•হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.)-এর উট একটি আনসারীর বাগানে প্রবেশ করে ক্ষতি করে। এ বিষয়ে রাসূল ﷺ ফয়সালা দেন যে, দিনের বেলায় কৃষিজমির মালিক তাদের ফসল রক্ষা করবে এবং রাতের বেলায় পশুর মালিক পশু নিয়ন্ত্রণ করবে।
•ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, এক ইয়াহুদী এক কিশোরীর উপর নির্মম নির্যাতন করে এবং তাকে হত্যা করে। পরে কিশোরী তার শেষ মুহূর্তে ইশারার মাধ্যমে অপরাধীর পরিচয় নিশ্চিত করে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ন্যায়বিচারের নির্দেশ প্রদান করেন এবং অপরাধীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
•ইমাম বুখারী (রহ.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, সাবিত ইবনে কায়েস (রা.)-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে বলেন যে, তিনি স্বামীর দ্বীনদারী ও চরিত্রে কোনো দোষ দেখেন না, তবে তিনি বৈবাহিক জীবনে থাকতে নিজের ঈমান হারানোর আশঙ্কা করছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেনমোহর ফিরিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেন। পরে তিনি তা ফিরিয়ে দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বিচ্ছেদ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন।
•ইমাম আহমদ (রহ.) হযরত জাবের (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, এক সাহাবীর শহীদ হওয়ার পর তার দুই কন্যা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হলে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থাপন করা হয়। পরে মিরাসের আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ

তাদের চাচাকে নির্দেশ দেন যে, সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ কন্যাদের প্রদান করতে, এক-অষ্টমাংশ তাদের মাকে দিতে এবং অবশিষ্ট অংশ নিজে রাখতে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের বিচার ব্যবস্থা ছিল মানব ইতিহাসের সর্বোচ্চ ন্যায়ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় ধর্ম, আইন, নৈতিকতা ও মানবাধিকার একত্রে সমন্বিত হয়েছিল। ফলে সমাজে ন্যায়, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
ইসলামী বিচার ব্যবস্থা আজও একটি আদর্শ মডেল হিসেবে বিবেচিত, যা আধুনিক বিচার ব্যবস্থার জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করতে সক্ষম।

রাসূল (সা.)এর জীবদ্দশায় বেশ কিছু সাহাবী সহযোগী বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :
১)হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)
২)হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)
৩)হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)
৪)হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.)
৫)হরযত উকবা ইবনে আমের আল -জুহানী (রা.)
৬)হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার (রা.)
৭)হরযত হুযায়ফা ইবনূল ইয়ামান (রা.)
৮) হযরত আমর ইবনূল আস (রা.)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আলী (রা.) কে যখন ইয়ামানের কাজী নিযুক্ত করেছিলেন। তখন হযরত আলি (রা.) এর বয়স খুব একটা হয়নি তাই তিনি বিচারক হতে আপত্তি করলে তখন রাসূল (সা.) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,
"আল্লাহ অবশ্যই তোমার অন্তরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। এবং যথার্থ রায় তোমার জবান দিয়ে বের করে তোমার জবানকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবে। তবে যখন বিবাদমান দুই পক্ষ তোমার সামনে উপস্থিত হবে তখন দ্বিতীয় পক্ষ থেকেও সেভাবেই বক্তব্য শ্রবণ করে নিও যেভাবে প্রথম পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করেছ। কারণ এ দ্বারা বিচারের বিষয়টি তোমার নিকট সুস্পষ্ট হওয়ার জন্য খুবই সহায়ক হবে।"

রাসূল (সা.) বলেন ,"আল্লাহ বিচারকের সঙ্গে থাকে যতক্ষণ না সে জেনে বুঝে জুলুম করে। "
আরো বলেন," তুমি যদি ফয়সালা করো আর ফয়সালা যথার্থ হয় তাহলে তুমি দশটি নেকি পাবে আর যদি তুমি ন্যায় সঙ্গত ফয়সালা করার জন্য পরিপূর্ণরূপে চেষ্টা করার পরও ভুল হয়ে যায় তাহলে তুমি একটি নেকি পেয়ে যাবে।"

হযরত আলা ইবনুল হাযরামী (রা.) কে বাহারাইন এর বিচারক নিয়োগ করে ,বাহারাইন বাসীদের উদ্দেশ্যে রাসূল (সা.) একটি চিঠি প্রেরণ করে। সেই চিঠির কিছু অংশ বিশেষ: "তোমরা আমার কথা মানবে এজন্য যে তোমাদের উপর আমার অধিকার ও দাবি রয়েছে ।তোমাদের ওপর আমার এত বড় দাবি রয়েছে যা পরিপূর্ণ আদায় করা তোমাদের সাধ্যতীত। "

*হযরত আবু বকর রা এর যুগে বিচার ব্যবস্থা -

হযরত আবু বকর (রা.) এর খেলাফতকাল ১১ হিজরী থেকে 13 হিজরী; দুই বছর। হরযত আবু বকর (রা.) এর যুগেও নবীর যুগের ন্যায় একই পদ্ধতিতে বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। খলিফা হিসেবে তিনি প্রধান বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন ।তিনি নিজেই মুকাদ্দামার বিচার করতেন বলে বিভিন্ন বর্ণনায় উল্লেখ আছে ।তবে পরের রাষ্ট্রীয় অন্যান্য কাজের ব্যস্ততার কারণে আবু বকর (রা.) বিচার বিভাগের দায়িত্ব হযরত ওমর (রা.) এর উপর এবং বায়তুল মালের দায়িত্ব হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জার (রা.) এর উপর অর্পণ করেছিলেন। বর্ণিত আছে যে দীর্ঘ এক বছরের মাঝে হযরত ওমর (রা.) এর দরবারে একটিও বিচার উত্থাপিত হয়নি। আবু বকর (রা.) এর যুগে বিচার ব্যবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি।

*হযরত ওমর রা এর যুগে বিচার ব্যবস্থা-

হযরত ওমর (রা.) এর খেলাফত কাল ১৩ হিজরি থেকে ২৩ হিজরী পর্যন্ত মোট ১১ বছর। খলিফা হিসেবে হযরত ওমর (রা.) প্রধান বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন। হযরত ওমর (রা.)এর বিচার পদ্ধতি ছিল আবু বকর (রা.) এর অনুরূপ ।তবে তিনি

কুরআন -সুন্নাহ এ কোন বিধান না পেলে অনুসন্ধান করে দেখতেন আবু বকর (রা.) অনুরূপ কোন বিচার করেছিলেন কিনা। যদি আবু বকর (রা.) অনুরূপ কোন বিচার করেছিলেন বলে জানতে পারতেন তাহলে সে ভিত্তিতেই তিনি ফয়সালা করতেন। অন্যথায় তিনি নেত্রী-স্থানীয়দের সমবেদ করতেন তারা যে সিদ্ধান্তের উপর ঐক্যমত পৌঁছতেন তা বিচার করতেন।

* হযরত আবু মূসা আশ'আরির প্রতি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের একটি চিঠি রয়েছে। তার কিছু অংশ বিশেষ-

"বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা অন্যতম বলিষ্ঠ এক ফরজ দায়িত্ব। এবং সর্বকালের অনুসৃত এক সুন্নত ।যখন তোমার নিকট এক মুকাদ্দামা উত্থাপিত হয় ,তখন তা গভীরভাবে বুঝার চেষ্টা করবে। কেননা যা কার্যকর হবে না, এমন কোন বিষয় অহেতুক কথোপকথনে কোন লাভ নেই।আপন এজলাশে এবং লোকেদের প্রতি আপন অভিমুখতায় সাম্য ও সমতা বজায় রাখবে। যাতে কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি তোমার দ্বারা কোন অন্যায়ের সিদ্ধান্ত করিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী না হয়ে উঠতে পারে, আর কোন গরিব-দুর্বল ব্যক্তি তোমার কাছ থেকে ইনসাফ পাওয়ার ব্যাপারে নৈরাশের শিকার না হয়ে যায়। কোন দুর্বল ব্যক্তি যেন তোমার কঠোরতার কারণে ভীতু সন্ত্রস্ত না হয়ে পড়ে।
যিনি কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করবেন সাক্ষী উপস্থিতি করা তার দায়িত্ব আর যিনি অভিযোগ অস্বীকার করবেন সাক্ষী না থাকলে তাকে কসম খেতে হবে।

মানুষের মাঝে বিভাগের আপস রক্ষা করে দেওয়া বৈধ তবে যে আপস দ্বারা কোন বৈধ বিষয়কে অবৈধ হয়ে যায় কিংবা কোন হারাম বিষয়ে হালাল হয়ে যায় তা অবশ্যই বৈধ নয় ।
পূর্বে তুমি যদি কোন ফয়সালা করে থাকো সে ব্যাপারে পরে চিন্তা করে যদি কোন ভিন্ন সিদ্ধান্ত তোমার কাছে সঠিক বলে মনে হয়। তাহলে পূর্ব রায় প্রত্যাহার করে সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে ফিরে আসতে দ্বিধা করবে না। কেননা ন্যায় ও সত্য স্বধার্থ চিরন্তন ।কোন বস্তুই তাকে বাতিল করতে পারবেনা। বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার চেয়ে সত্যের দিকে ফিরে আসা অবশ্যই উত্তম।

কুরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধান যে ক্ষেত্রে বর্ণিত নেই সে সব ক্ষেত্রে যদি তোমার সংশয় সৃষ্টি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে গভীর চিন্তা ভাবনা করে বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো।
যদি কোন ব্যক্তি এরূপ দাবী করে যে তার বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে তবে সে তা এই মুহূর্তে উপস্থিতি করতে পারছে না তাহলে তাকে তার প্রমাণ উপস্থিতি করার জন্য একটু অবকাশ দিও। যাতে সে তার প্রমাণ উপস্থিতি করতে পারে ।ওই নির্ধারিত সময়ের মাঝে যদি সে প্রমাণ উপস্থিত করতে পারে ।তাহলে তার অধিকার ও হোক সে পেয়ে যাবে ।আর যদি ওই সীমার মধ্যে প্রমাণ উপস্থিত করতে না পারে। তাহলে তার উপর বিচারের রায় কার্যকর করা তোমার জন্য বৈধ হয়ে যাবে। এতে তার অভিযোগ করার কোন সুযোগ থাকবে না এবং তার অক্ষমতার বিষয়টি তার নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে।"

*হযরত মুআবিয়াহ রা এর প্রতি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের চিঠির কিছু অংশ-

"এখন তোমাকে বলছি পাঁচটি বিষয়ে সুদৃঢ় ভাবে আঁকড়ে থাকো তাহলে তোমার দ্বীনও রক্ষা পাবে আর তোমার প্রাপ্য প্রতিদান তুমি পরিপূর্ণ লাভ করবে ।
১)যখন বিবাদমান দুই পক্ষ তোমার সামনে উপস্থিত হবে তখন তুমি অবশ্যই ন্যায়বিত্তিক প্রমাণ কিংবা প্রত্যয়ী কসমে ভিত্তিতেই কেবল ফয়সালা করবে।
২)দুর্বলদেরকে তোমার কাছে আসার সুযোগ দিও যাতে তাদের হৃদয় বলিষ্ঠ হয় এবং মুখ খোলার সাহস পায়।
৩)বিদেশীদের প্রতি লক্ষ্য রেখো ।কেননা যদি তুমি তাদের প্রতি লক্ষ্য না রাখো তাহলে তারা তাদের অধিকার বিসর্জন দিয়ে স্বদেশে ফিরে যাবে।
৪)যারা দুর্বল হওয়ার কারণে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না তাদের বিলুপ্ত অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দিও।
৫)যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মুকাদ্দামার রায় কি হওয়া উচিত তা স্থির করতে না পারবে ,ততক্ষণ দুই পক্ষের মাঝে মীমাংসা করার চেষ্টা করে যাবে।
৬)বাদী বিবাদীকে দরবারে বসানো ও তাদের প্রতি তাকানোর ক্ষেত্রে সাম্য রক্ষা করবে।"

হযরত ওমর (রা.) বিচারকদের ভাতা প্রদানের প্রথার প্রবর্তন করেন ।তিনি কাযী সুলাইমান ইবনে রাবি'আর জন্য ৫০০ দিরহাম মাসোহারা এবং কাযী সুরায়হ নের জন্য ১০০ দিরহাম মাসোহারা ধার্য করেছিলেন। তিনি বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে পৃথক করে দেন ।বিচার ব্যবস্থা তার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। তিনি বিচারকদের খোঁজখবর রাখতেন এবং তাদের কাছে চিঠি পত্রের মাধ্যমে নাসিহা প্রেরণ করতেন। তবে বিচারকার্যে তাদের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতেন না।

*হযরত উসমান (রা.) এর বিচার ব্যবস্থা

হযরত উসমান (রা.) ২৩ হিজরীতে খেলাফত লাভ করেন ।এবং ৩৫ হিজরীর পর্যন্ত এই পদে সমাসীন থাকেন। তার খেলাফত কাল ছিল ১৩ বছর । হযরত উসমান (রা.) এর যুগেও হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) কাযী পদে বহাল ছিলেন।

*হযরত আলী (রা.) এর বিচার ব্যবস্থা

হযরত আলী (রা.) এর খিলাফত কাল ছিল পাঁচ বছর অর্থাৎ ৩৫ হিজরী থেকে ৪0 হিজরী পর্যন্ত। তার খিলাফত কালেও পূর্বের ন্যায় বিচার ব্যবস্থা বহাল ছিল। বিচারক হিসেবে সাহাবীগণের মাঝে হরযত আলী (রা.) ছিলেন শ্রেষ্ঠ স্থানীয় । এজন্য তার প্রশংসায় বলা হত 'তিনি ছিলেন বিচারকার্যে সর্বাধিক দক্ষ'।

খেলাফায়ে রাশেদীনের যুগে বিচার বিভাগ ছিল প্রশাসন থেকে আলাদা এবং অতি সম্মানিত একটি বিভাগ। কাযী নিয়োগের ক্ষেত্রে জ্ঞান ,পাণ্ডিত্য ও তাকওয়ার প্রতি অধিক গুরুত্ব করা হতো। পহেজগারী ও ন্যায় পরায়ণতার দিকটাও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হতো। তবে সে সময় কাযীর দরবারে বিচারকের রায় লিপিবদ্ধ করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এজন্য কোন লোকও নিয়োজিত থাকত না ।কারণ তখন বিচার তৎক্ষণাৎ কার্যকর করে ফেলা হতো। আর বিচারক নিজেই তা কার্যকর করতেন।

* উমাইয়াদের শাসনামলের বিচার ব্যবস্থা

উমাইয়ারা ৪০ হিজরী থেকে ১৩২ হিজরী পর্যন্ত মোট ৯২ বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। কুরআন সুন্নাহ ও শরিয়া নীতিমালার ভিত্তিতে বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হতো ।এ সময় বিচারকগণ সাধারণ মুজতাহিদ হতেন। যদি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে জটিলতা বোধ করতেন তাহলে ঐ ব্যাপারে অন্যান্য ফিকহবিদদের থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করতেন। অনেক ক্ষেত্রে খলিফা কিংবা স্থানীয় প্রশাসকদের থেকে উত্থাপিত বিষয়ে কি রায় হবে তা বিচারক জেনে নিতেন ।তবে এ দ্বারা বিচার প্রভাবিত হতো না ।কেননা খলিফা ও স্থানীয় প্রশাসকদের মতামত গ্রহণের পরও রায় প্রদানের ক্ষেত্রে বিচারকরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন ।বিচারক তার স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে যে রায় দিতেন সেটাই চূড়ান্তভাবে কার্যকর হতো। অপর পক্ষে খলিফা তাদের বিচারকার্যের তদারকি করতেন। প্রয়োজনে তিনি বিচারককে বরখাস্ত করতে পারতেন। এ সময়ে বিচারকগণ কোনো মাযহাবের অনুসরণ করতেন না কেননা সে সময় পর্যন্ত ফেকহী মাযহাবের উৎপত্তি হয়নি। খলিফা নিজেই কাযীদের নিয়োগ করতেন কিংবা তৎকর্তৃক মনোনীত কোন গভর্নর বা প্রশাসক এই দায়িত্ব পালন করতেন। কোন কাযীই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতো না অর্থাৎ প্রধান কাযীর কোন পদ তখন ছিল না ।এবং অন্যদের উপর কারো কর্তৃত্ব থাকত না।
ফৌজদারী মামলাগুলো সরাসরি খলিফা কিংবা তার কর্মকর্তাগণ গ্রহণ করতেন। বিচারের রায় লিপিবদ্ধ করণের প্রথা উমাইয়াগণ প্রবর্তন করেন। খেলাফায়ে রাশেদীনের যুগে রায় লিপিবদ্ধকরণের প্রথা ছিল না। পূর্বের প্রথা অনুসারে কাযীদের বেতন ভাতা বায়তুল মাল থেকে বরাদ্দ করা হতো ।এবং সেটিকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে বরাদ্দকৃত বিশেষ ভাতা বলে উল্লেখ করা হতো।

উমাইয়াদের বিচার ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো-

১)যেসব বিষয়ে নস বিদ্যমান নেই আর পূর্বসূরীদের কোন ইজমাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেসব বিষয়ে কাযী তার ইজতিহাদ অনুসারে ফয়সালা করতেন,প্রয়োজনে অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন।

২)বিচার বিভাগ রাজক্ষমতা বা রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হতো না ।কেননা বিচার বিভাগ ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। আর রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের প্রভাবে বিচার ব্যবস্থা প্রভাবিত হতো না। বিচারকদের রায় চূড়ান্তভাবে কার্যকর হতো। এমনকি প্রশাসক বা কর্মকর্তাদের উপরও বিচারকের সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে কার্যকর হত।

আব্বাসী শাসনামলে বিচার ব্যবস্থা

আব্বাসীরা ১৩২ হিজরী থেকে ৬৫৬ হিজরী পর্যন্ত মোট ৫২৪ বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের শাসন আমলে রাষ্ট্রের উন্নতি চরম শিখরে পৌঁছায়।

উন্নতির ক্ষেত্রে তিনজন সম্রাটের অবদান অনেক বেশি-

১)আবু জা'ফর মনসূর; তিনি ১৩৬ হিজরী থেকে ১৫৮ হিজরী পর্যন্ত শাসন করেন। তার শাসনামলে রাষ্ট্র সুদীর্ঘ অপকাঠামগত ভিত্তি লাভ করেন।

২)হারুনর রশিদ; তিনি ১৭০ হিজরী থেকে ১৯৩ হিজরী পর্যন্ত শাসন করেন ।তার শাসনামলে রাষ্ট্রে শান্তি নিরাপত্তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ,নাগরিকদের সচ্ছলতা বৃদ্ধি পায় ,অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়। আন্তর্জাতিকভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

৩)মামুনুর রশিদ;তিনি ১৫৮ হিজরী থেকে ২১৮ হিজরী পর্যন্ত দেশ শাসন করেন। তার শাসনকালে দেশটির ভৌগোলিক পরিসীমা সম্প্রসারিত হয়। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির উন্নতি শীর্ষে পৌঁছায়।

এক সময় ইসলামী বিধি-বিধান মারাত্মক সংকটের মুখোমুখি হয়। তাই দুটি বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে-

১) শরীয়তের বিধান সমূহ কে গ্রন্থকারে সংকলিত করে ফেলা।

২) শরীয়তের মূলনীতি সমূহ থেকে আনুষাঙ্গিক বিধান আহরনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলনীতির উদ্ভাবন এবং তার আলোকে চলমান জীবনের নিত্য নতুন ঘটনার জন্য বিধি-

বিধান তৈরি করা। এ সময় বিভিন্ন মাজহাবের উৎপত্তি হয় ।যে অঞ্চলে যে মাযহাবের ইমামের প্রভাব বেশি ছিল সে অঞ্চলের লোকেরা সেই মাযহাব অনুসারে চলতে থাকে। মাযহাবের উৎপত্তির ফলে বিচার ব্যবস্থায় বিরাট প্রভাব পড়ে। যেমন :ইরাকের কাযীরা ইমাম আবু হানিফা (রাহ.) এর , পশ্চিমাঞ্চল ও সিরিয়ার কাযীগণ ইমাম মালেক (রাহ.) এর, মিশরের কাযীরা ইমাম শাফিয়ী (রাহ.) মাযহাব অনুসরণ করে বিচার করতেন । কোন কোন আব্বাসী খলিফা সকল মাযহাবের মাঝে সমন্বয় করে এমন একটি সামগ্রিক বিধান প্রণয় করতে চেয়েছিলেন। যার আলোকে বিচারকগণ সর্বোচ্চ বিচার কার্যসম্পাদন করবেন কিন্তু মাযহাব অনুসারী আলেম-ওলামাগণ বিষয়টিকে সমর্থন করেননি ।আব্বাসী যুগে আলেম-ওলামাদের ও কাযীদেরকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হতো ।অসময়ে যাতে কেউ প্রবেশ না করতে পারে তাই দরবারে দারোয়ান মোতায়ন থাকতো ।শৃঙ্খলা রক্ষা করা হতো কঠোরভাবে ।নগরের মধ্যবর্তী কোন প্রশস্ত ও স্বাস্থ্যকর স্থানে কাযীর দরবার বসত যাতে লোকজন সেখানে আসতে ও বসতে কোন কষ্ট না হয়। কবে কোন বিষয়ে বিচার হবে এবং কোন কোন দিন দরবার বসবে তা পূর্ব থেকে নির্ধারিত। সকল বিচারের রায় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হতো। ওসিয়াত ও পাওনার বিষয়ে আলাদা রেজিস্ট্রার ছিল। যিনি সাক্ষী দিতে আসতেন তিনি যদি কাযীর কাছে বিশ্বস্ত বলে জ্ঞাত হতেন তাহলে তার সাক্ষী গ্রহণ করা হতো ।আর যদি পরিচিত না হতেন তাহলে সাক্ষী দানের বিষয়টি স্থগিত রাখা হতো ।সাক্ষী অজ্ঞাত পরিচয় হলে তার ব্যাপারে স্থানীয় লোকেদের ও প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো।

খলিফা মনসূরের শাসনামলে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের বিষয়টি যখন ব্যাপক হয়ে পড়ে, তখন মিশরের কাযী গাওস ইবনে সুলাইমান সর্বপ্রথম সাক্ষীদের সম্পর্কে গোপন তথ্য-হরণের বিষয়টির সূচনা করেন ।পরে কাযী মুফাজ্জল ইবনে ফুযালা মিশরে সর্বপ্রথম সাক্ষীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা বাদের জন্য বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে একদল দায়িত্বশীল নিয়োগ করেন। যাদের পদবী ছিল জিজ্ঞাসাবাদ এর দায়িত্বশীল। পরে খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনামলে মিশরের কাযী আব্দুর রহমান আল উমারী সাক্ষীদের নাম ঠিকানা ও পরিচয় সংরক্ষণের জন্য আলাদা রেজিস্টারের তৈরি সূচনা করেন ।অবশ্য পরে অন্যান্য কাযীগণ ও তার পদ্ধতিকে অনুসরণ করেছিল।

আব্বাসী যুগে " কাযীউল কুযাত" নামের প্রধান কাযীর একটি পদ সৃষ্টি করা হয়। খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনামলে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) কে সর্বপ্রথম "কাযীউল কুযাত" পদে নিয়োগ করা হয়। প্রধান কাযী খলিফার পক্ষ থেকে মনোনীত হতেন

এবং বিচার বিভাগের পূর্ণাঙ্গ দায়িত্বপ্রাপ্ত হতেন। সকল কাযী তার নিয়ন্ত্রণে থাকতো। আঞ্চলিক কাযীদের নিয়োগ বরখাস্ত তার নিয়ন্ত্রণে থাকতো। তাদেরকে দিকনির্দেশনা দান,কাজের তদারকি করা এবং তাদের রায় সমূহ পর্যালোচনা করে দেখা এসব প্রধান কাযীর দায়িত্ব হতো। আব্বাসী যুগেও কাযীদের জন্য নিয়মিত ভাতা বরাদ্দ করা হতো।

আব্বাসীদের পরবর্তী যুগের বিচার ব্যবস্থা

ইসলামী সম্রাজ্যের ক্ষমতা চলে যায় তাঁতারীদের হাতে ।এ সময় থেকে নিয়ে ৯২৩ সালে উসমানী দের ক্ষমতা লাভ পর্যন্ত ২৬৭ বছর মুসলিম বিশ্বে বিরাট রাজনীতি অস্থিরতা বিরাজিত ছিল।

বিশাল ইসলামী সম্রাজ্য তখন তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে-

১)বাগদাদ কেন্দ্রিক আব্বাসীদের সাম্রাজ্য।

২)পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ সমূহ নিয়ে ফাতেমী সাম্রাজ্য।

৩)আন্দুলস কেন্দ্রিক উমাইয়াদের সাম্রাজ্য ।

আব্বাসী খলিফাদের রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে একেক অঞ্চল নিয়ে একেকজন স্বাধীন রাজ্যের ঘোষণা দেয়। মঙ্গোলিয়ান, তুর্কি, পারস্য ও গোলাম বংশ এবং বারবারিয়ানদের দৌরাত্মের ফলে বৃহৎ ইসলামী সাম্রাজ্য ভেঙে যায়। এর ফলে ইসলামী অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়,মুসলমান সভ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।ফলে মুসলিম উম্মাহ আত্মকলহলের শিকার হয়। পরে ৯২৩ হিজরীতে তুর্কিদের ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে উসমানী সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়। কাযীদের বিপর্যয়ের ইতিহাসের সূচনা এ সময় থেকেই শুরু হয় ক্রমগত তা মানব রচিত আইন ও বিচার ব্যবস্থায় পরিণত বরণ করে ।

উসমানী শাসনামলের বিচার ব্যবস্থা

৬৯৯ হিজরীতে সালজুকীদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের ছোট একটি রাষ্ট্র হিসেবে উসমানী সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে।আল্লামা ফরিদ বোক উল্লেখ করেন যে ,আব্বাসী খেলাফতের পতনের পর বনি আব্বাসের জনৈক ব্যক্তি মিশরে গমন করে। মিশর তখন বাইব্রাসের শাসনাধীন ছিলেন ।বনি আব্বাসের ওই লোকটি বাইব্রাস এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আব্বাসীদের অবস্থা সম্পর্কে তাকে অবগত করেন। বাইব্রাস তার সঙ্গে এই মর্মে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন যে, তিনি তার সম্রাজ্যে ইসলামী খলিফা প্রতিষ্ঠা করবেন আর আব্বাসী খলিফাদের পক্ষ থেকেও এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে তাহলে খিলাফতের দায়িত্ব তার হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। এভাবে খিলাফত তখন মিশরে স্থানান্তরিত হয়ে যায়।

কিন্তু তিন বছর পর উসমানীরা মিশর দখল করে নেয়। তখন আব্বাসী খলিফা তার কাছ থেকে খিলাফতের দায়িত্ব প্রত্যাহার করেন। এবং সুলতান সলীম উসমানীকে তা সমর্পণ করে। এভাবে খিলাফত উসমানীদের হাতে চলে যায়।

বস্তুত ৯২৩ হিজরিতে মিশর বিজয়ের মধ্য দিয়ে উসমানী সাম্রাজ্যের পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং ১৩৩৫ হিজরী পর্যন্ত তার টিকে থাকে উসমানীরা মোট ৪১২ বছরের ইসলামিক খিলাফতের দায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল।

উসমানী সাম্রাজ্যের বিচার ব্যবস্থার তদারক করার জন্য দুইজন দায়িত্বশীল ছিলেন । একজন হলেন শায়খুল ইসলাম কাযী আসকার রোমালী ;তিনি ইউরোপের উসমানীদের নিয়ন্তণাধীন অঞ্চলের আঞ্চলিক কাযীদের দায়িত্বে ছিলেন ।অপরজন হলেন কাযী আসকার আনযৌল; তিনি এশিয়া ও মিশরীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক কাযীদের দায়িত্বে ছিলেন। উসমানী সম্রাজ্যের বিচার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে কাযীগণ নিয়োজিত হতেন। হিজরির ত্রয়োদশ শতকের শেষ ভাগে তারা ইসলামী আইন থেকে নাগরিক জীবন সংশ্লিষ্ট আইন গুলো বাছাই করে নাগরিক আইন সংক্রান্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করার উদ্যোগ নেয় এই ভিত্তিতে যে আইনি ভলিউম তৈরি করা হয়। এর নাম দেওয়া হয় 'আহকামুল আদালিয়্যাহ'। এবং তাতে ১২৮৬ হিজরী পর্যন্ত মোট ১৮৫১টি বিষয়ের আইন সংকলিত হয় ।

ইসলামী দুনিয়ায় মানব রচিত আইন এর ভিত্তিতে বিচার কার্য পরিচালনা এবং আধুনিকতার নামে পশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণা ও বিধানকে আত্মস্থ করার এই প্রবণতা

উসমানী সাম্রাজ্যের প্রথম সূচিত হয় ।পরে ইসমাইল পাসা যখন ক্ষমতায় আদিষ্ট হয় উসমানী আমলের বিচার ব্যবস্থা থেকে সে সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে এসে পশ্চাত্যের আইনের আলোকে তা পুনর্বিন্যস্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। তার ব্যক্তিগত উপদেষ্টা ছিলেন জনৈক ফ্রান্সবাসী। সে তাকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে এবং বিচার ব্যবস্থায় তা কার্যকর করে ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে

১৩৩৫ হিজরীতে উসমানী সাম্রাজ্যের পতনের ফলে পশ্চাত্যের জন্য মুসলিম বিশ্বের উপর হামলা করার সুযোগ অবারিত হয়। তারা তখন মুসলমান বিশ্বের উপর শিক্ষা ও সাংস্কৃতির অগ্রসন চালাতে শুরু করে ।মুসলিম বিশ্বের এক শ্রেণী লোক হীনমন্যতার শিকার হয়ে পশ্চাত্যের জীবন বোধ,ধ্যান-ধারণা,তাদের চিন্তাধারা ও আইন কানুনের অগ্রগতি এর সোপান ভেবে খুশি মনেই তা বরণ করে নেয়।
১৯৬৬ ইংরেজি সালের এদিকে এসে ইসলামী আইন সম্পন্ন রূপে বাদ দিয়ে পশ্চাত্যের বিধি-বিধানের সকল ক্ষেত্রে কার্যকর হয়ে । আজকের সারা দুনিয়াতে জুলুম, অত্যাচার ,অন্যায় ,অবিচারের যে সয়লাব আমরা লক্ষ্য করছি তা ইসলামী বিচার ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফল। ইসলামী আইন আল্লাহ ও রাসূল কর্তৃক প্রদত্ত বলেই সর্বোচ্চ মাত্রায় আত্মনিরপেক্ষ।

ইসলামী ন্যায় বিচার:

ন্যায়বিচার ইসলামের অন্যতম মৌলিক ও অপরিহার্য নীতি। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসন ও বিচারকার্যের ভিত্তি হলো ইনসাফ, যেখানে সকল মানুষের প্রতি সমান আচরণ নিশ্চিত করা আবশ্যক। এখানে ধনী-গরিব, শক্তিশালী-দুর্বল, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ কিংবা ক্ষমতাবান-অক্ষম—কারও মধ্যে কোনো প্রকার বৈষম্যের সুযোগ নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে বিচারকের মূল দায়িত্ব হলো সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা

করা। কারণ ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা রক্ষাই হলো বিচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং একটি সুস্থ সমাজ গঠনের প্রধান ভিত্তি।

মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন:

“আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করবে, তখন ন্যায়বিচারের সাথে বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ প্রদান করেন।” (সূরা নিসা, আয়াত: ৫৮)

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিচারকার্যে কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব বা অন্যায় আচরণের স্থান নেই। বরং সর্বদা ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যক।

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।” (সূরা নাহল, আয়াত: ৯০)

এই আয়াতটি ইসলামী জীবনব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ নৈতিক কাঠামো উপস্থাপন করে, যেখানে ন্যায়বিচারকে কেন্দ্র করে সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এটি শুধু একটি উপদেশ নয়, বরং একটি সার্বজনীন নীতিমালা, যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র—সব পর্যায়েই প্রযোজ্য।

তাই কুরআনের ভাষায় এটি নিঃসন্দেহে “উত্তম উপদেশ”। এই উপদেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক, বিশেষ করে যারা সমাজে ছোট-বড় বিভিন্ন পর্যায়ে বিচারক বা মীমাংসাকারীর ভূমিকা পালন করেন। পারিবারিক বিরোধ, সামাজিক সমস্যা কিংবা স্থানীয় পর্যায়ের সালিশ—যেখানেই বিচার করা হোক না কেন, সেখানে অবশ্যই ন্যায়, সততা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা জরুরি।

কোনো অবস্থাতেই ব্যক্তিগত সম্পর্ক, স্বার্থ, ভয় বা প্রভাবের কারণে কোনো পক্ষের দিকে ঝুঁকে পড়া উচিত নয়। কারণ সামান্য অন্যায়ও সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে এবং মানুষের আস্থা নষ্ট করে দেয়।

সুতরাং ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা শুধু একটি নৈতিক দায়িত্ব নয়, বরং ইসলামী জীবনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, যা সমাজে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করে।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচারক -

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচারক বা কাযী হলেন সেই ব্যক্তি যিনি শরীয়াহ আইন অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করেন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামে বিচারক শুধু একজন আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা নন, বরং তিনি সমাজে ন্যায়, ইনসাফ ও সত্য প্রতিষ্ঠার একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি।

ইসলামী দৃষ্টিতে বিচারকের ভূমিকা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ, কারণ তিনি মানুষের অধিকার রক্ষা করেন এবং সমাজে শান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করেন। বিচারকের রায় শুধুমাত্র আইনের ভিত্তিতে নয়, বরং কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়।

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করলে ন্যায়বিচার করবে।”(সূরা আন-নিসা ৪:৫৮)

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচারক শুধু একজন প্রশাসনিক ব্যক্তি নন, বরং তিনি ন্যায়, সত্য ও আল্লাহভীতির প্রতীক। তার যোগ্যতা, দায়িত্ব, নৈতিকতা এবং স্বাধীনতা ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি শক্তিশালী করে।

*বিচারকের যোগ্যতা

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচারক হওয়ার জন্য কিছু নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। এগুলো শুধু প্রশাসনিক দক্ষতা নয়, বরং নৈতিক ও ধর্মীয় গুণাবলির সমন্বয়।

১) বিচারককে মুসলিম হতে হবে এবং ইসলামী আইন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। কুরআন, হাদিস এবং ফিকহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য।

২) বিচারকের মানসিক সুস্থতা ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া জরুরি, যাতে তিনি সঠিকভাবে বিচারিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

৩) বিচারকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো ন্যায়পরায়ণতা। তিনি কোনো পক্ষপাতিত্ব ছাড়া নিরপেক্ষভাবে বিচার করবেন।

৪)সততা, আমানতদারি এবং চরিত্রের পবিত্রতা বিচারকের মৌলিক শর্ত হিসেবে গণ্য হয়।

“আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।”(সূরা আল-মায়িদা ৫:৪২)

৫)একজন বিচারকের মধ্যে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি থাকা আবশ্যক, যাতে তিনি কোনো অন্যায় সিদ্ধান্ত না নেন। ধৈর্য, বিনয় এবং সংযম তার অপরিহার্য গুণ।
৬)তিনি কখনো আবেগ, রাগ বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। সত্যবাদিতা এবং নিরপেক্ষতা তার মূল ভিত্তি হওয়া উচিত।

* বিচারকের দায়িত্ব

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচারকের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বহুমাত্রিক। তার প্রধান দায়িত্ব হলো সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।
বিচারককে সব ধরনের মামলা নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করে তা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়। তিনি সাক্ষ্য ও প্রমাণ যাচাই করে সত্য নির্ধারণ করেন এবং শরীয়াহ অনুযায়ী রায় প্রদান করেন।
তিনি দুর্বল, দরিদ্র এবং অসহায় মানুষের অধিকার রক্ষা করেন এবং নিশ্চিত করেন যে কেউ অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
এছাড়াও বিচারকের দায়িত্ব হলো মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করা, যাতে ন্যায়বিচার বিলম্বিত না হয়।
“ন্যায়বিচার করো, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে যায়।”(সূরা আন-নিসা ৪:১৩৫)
বিচারককে নম্রতার সাথে জনগণের সাথে আচরণ করতে হবে কঠোরতা প্রদর্শন করা যাবে না

* বিচারকের স্বাধীনতা -

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচারকের স্বাধীনতা একটি মৌলিক নীতি। বিচারক কোনো রাজনৈতিক চাপ, ক্ষমতাধর ব্যক্তির প্রভাব বা ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারবেন না।
তিনি শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবেন এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেবেন।
বিচারকের স্বাধীনতা নিশ্চিত না হলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।
এই স্বাধীনতা বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী, নিরপেক্ষ এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে।

ইসলামে বিচারক সম্পূর্ণ স্বাধীন হলেও তিনি জবাবদিহিতার বাইরে নন। তিনি আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ।
হাদিসে বলা হয়েছে, বিচারক তিন ধরনের হতে পারেন—একজন জান্নাতি এবং দুইজন জাহান্নামী, তাদের কাজের উপর ভিত্তি করে।

* বিচার প্রক্রিয়ায় বিচারক-

বিচার প্রক্রিয়ায় বিচারকের ভূমিকা অত্যন্ত কেন্দ্রীয়। তিনি পুরো বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করেন।
প্রথমে তিনি মামলা গ্রহণ করেন এবং এর প্রাথমিক সত্যতা যাচাই করেন। এরপর তিনি উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনেন এবং সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন।
সব প্রমাণ বিশ্লেষণ করার পর তিনি শরীয়াহ অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গত রায় প্রদান করেন।তার রায় চূড়ান্তভাবে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে।
প্রধান বিচারকের উপস্থিতিতে নিম্নস্ত বিচারকরা বিচারকার্য সমাধান করতে পারবেন । বিচারকের অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য কোন জবাবদিহিতা নেই।

*বিচারকের মর্যাদা -

ইসলামে ন্যায়পরায়ণ বিচারকের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ। তাকে সমাজে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।
“ন্যায়পরায়ণ বিচারক কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় থাকবে।”(সহিহ মুসলিম)
বিচারক যতক্ষণ অন্যায়ের পথ অবলম্বন না করে এবং ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে ততক্ষণ জনগণ কেউ বিচারকের নির্দেশ মেনে চলতে হবে।
বিচারক ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে জনগণকে তার সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে ।

বিচার প্রার্থীর অধিকার-

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচার চাওয়া বা ন্যায়বিচার প্রার্থনা করা একটি মৌলিক অধিকার। সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা তখনই সম্ভব যখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার অধিকার আদায়ের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হতে পারে এবং সেখানে সমান সুযোগ পায়।বিচার প্রার্থী বলতে সেই ব্যক্তি বা পক্ষকে বোঝায়, যিনি কোনো অন্যায়, বিরোধ বা ক্ষতির প্রতিকার চেয়ে আদালতে মামলা উপস্থাপন করেন।

ইসলামে প্রতিটি মানুষের ন্যায়বিচার চাওয়ার অধিকার স্বীকৃত। কোনো ব্যক্তি যদি অন্যায়ের শিকার হয়, তবে সে বিচারকের কাছে গিয়ে তার অধিকার দাবি করতে পারে।

“তোমরা ন্যায়বিচার করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।”(সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:৯)

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচার প্রার্থীর মধ্যে কোনো ধরনের বৈষম্য করা হয় না। ধনী-গরিব, শক্তিশালী-দুর্বল, শাসক-শাসিত—সকলেই আইনের সামনে সমান।বিচারকের দায়িত্ব হলো উভয় পক্ষের বক্তব্য ধৈর্য সহকারে শোনা এবং সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা। ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় ন্যায়বিচার বিলম্বিত করা অনৈতিক বলে বিবেচিত হয়। বিচার প্রার্থী যেন দীর্ঘ সময় ধরে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত না হয়, সেটি নিশ্চিত করা বিচারকের দায়িত্ব।বিচারককে কোন মুকাদ্দামার রায় প্রদানের জন্য বাদী বিবাদী উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করে নিতে হবে ।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় কোনো রায়ে ভুল হলে তা সংশোধনের সুযোগ থাকে। অর্থাৎ বিচার প্রার্থী চাইলে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে পুনর্বিবেচনার আবেদন করতে পারে।

বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা-

বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা একটি সাংবিধানিক ও স্বাধীন বিচার কাঠামো, যার মূল উদ্দেশ্য হলো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের সংবিধান বিচার বিভাগকে রাষ্ট্রের একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিচার বিভাগের প্রধান দায়িত্ব হলো আইন ব্যাখ্যা করা, বিরোধ নিষ্পত্তি করা, অপরাধের বিচার করা এবং সংবিধান ও নাগরিক অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা মূলত সংবিধান, প্রণীত আইন, বিচারিক নজির এবং প্রচলিত আইনগত নীতির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। এর কাঠামো ব্রিটিশ উপমহাদেশের বিচারিক ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত এবং বর্তমানে এটি একটি স্বাধীন ও সাংবিধানিক বিচার ব্যবস্থা হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে বিচারকগণ আইন ও সংবিধানের আলোকে স্বাধীনভাবে বিচার কার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হন।

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ আদালত হলো সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট দুইটি বিভাগ নিয়ে গঠিত—আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগ।

আপিল বিভাগ দেশের সর্বোচ্চ বিচারিক কর্তৃপক্ষ, যেখানে হাইকোর্ট বিভাগ সংবিধান ব্যাখ্যা, মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্ত পর্যালোচনার ক্ষমতা রাখে। বাংলাদেশের নিম্ন আদালতসমূহ প্রধানত দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে বিভক্ত। দেওয়ানি আদালত সম্পত্তি, চুক্তি ও পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তি করে, আর ফৌজদারি আদালত অপরাধ সংক্রান্ত মামলার বিচার করে। এছাড়াও শ্রম আদালত, পরিবার আদালত, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালসহ বিভিন্ন বিশেষায়িত আদালত বিদ্যমান।

বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা। তবে বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জেরও সম্মুখীন। মামলা

জট, বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা, আদালতের উপর অতিরিক্ত চাপ এবং সীমিত অবকাঠামোগত সুবিধা বিচার কার্যক্রমকে অনেক সময় বিলম্বিত করে।

পাশ্চাত্য বিচারব্যবস্থা-

পাশ্চাত্য বিচারব্যবস্থা হলো এমন একটি আইন ও বিচার কাঠামো, যা মূলত ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকান রাষ্ট্রসমূহে বিকশিত হয়েছে এবং বর্তমানে বিশ্বের বহু দেশের বিচারব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে। এই বিচারব্যবস্থার ভিত্তি রোমান আইন , কমন ল, সিভিল ল এবং আধুনিক সাংবিধানিক নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত। এর প্রধান লক্ষ্য হলো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা, মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং নিরপেক্ষ বিচার নিশ্চিত করা।

পাশ্চাত্য বিচারব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো- ধর্মনিরপেক্ষতা। এখানে আইন প্রণয়ন ও বিচারকার্য মূলত মানবীয় জ্ঞান, সামাজিক চাহিদা এবং রাষ্ট্রীয় সংবিধানের আলোকে পরিচালিত হয়। আইনকে সাধারণত জনগণের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয় এবং সময় ও সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী তা সংশোধন বা পরিবর্তন করা সম্ভব।পাশ্চাত্য বিচারব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিচারকগণ নির্বাহী ও আইনসভা থেকে স্বাধীনভাবে বিচার কার্য পরিচালনা করেন এবং আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখেন। এই ব্যবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার, আইনজীবীর সহায়তা লাভের অধিকার এবং নিরপেক্ষ আদালতে বিচার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা হয়।

পাশ্চাত্য বিচারব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো “Rule of Law”, যার অর্থ হলো রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তি—শাসক কিংবা সাধারণ নাগরিক—আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। একই সঙ্গে এই ব্যবস্থায় মানবাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

তবে পাশ্চাত্য বিচারব্যবস্থা সম্পূর্ণ মানব-প্রণীত হওয়ায় আইন ও বিচারনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলতা লক্ষ্য করা যায়। সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক বাস্তবতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইন সংশোধন করা হয়। ফলে অনেক সময় এক দেশে যে বিষয় বৈধ, অন্য দেশে তা অবৈধ হতে পারে।

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা ও বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার -

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা ও বাংলাদেশের প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা—দুইটি ভিন্ন দার্শনিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা আইন ও ন্যায়বিচার কাঠামো। একটির ভিত্তি শরীয়াহ অন্যটির ভিত্তি সংবিধান ও মানবসৃষ্ট আইন।

১)ইসলামে বিচারব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর নির্দেশের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআন ও সুন্নাহ হলো এর মূল উৎস। বিচারক শুধু আইন প্রয়োগকারী নয়, বরং আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নকারী।

"আর যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার করবে, তখন ন্যায়বিচার করবে।" (সূরা আন-নিসা: ৫৮)

রাসূল ﷺ বলেছেন—

"ন্যায়বিচারকরা কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ডান পাশে থাকবে।" (সহিহ মুসলিম)

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা হলো মূলত ব্রিটিশ কমন ল' ভিত্তিক ও সংবিধান দ্বারা পরিচালিত। বিচারকের ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় আইন ও আদালতের কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

২)ইসলামিক ব্যবস্থায় আইনের উৎস হচ্ছে কুরআন,সুন্নাহ,ইজমা ও কিয়াস।

বাংলাদেশের ব্যবস্থায় আইনের উৎস হচ্ছে সংবিধান,সংসদ প্রণীত আইন,বিচারিক নজির ,প্রচলিত রীতি।

৩)ইসলামিক বিচার ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, সমাজে শান্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। অপরদিকে বাংলাদেশের ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ দমন এবং নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ।

৪) ইসলামিক ব্যবস্থায় শাস্তি দুই ধরনের হুদুদ ও তাজির।বাংলাদেশের ব্যবস্থায় শাস্তি আইন অনুযায়ী নির্ধারিত;যেমন: কারাদণ্ড, জরিমানা বা ফাঁসি। বিচারকের বিবেচনা তুলনামূলক বেশি।

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা মূলত দিব্য নির্দেশনা ও নৈতিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে ন্যায়বিচার ইবাদতের অংশ। অন্যদিকে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা একটি আধুনিক রাষ্ট্রীয় আইনি কাঠামো, যা নাগরিক অধিকার ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করে।দুই ব্যবস্থার লক্ষ্যই ন্যায়বিচার, তবে উৎস, দর্শন ও প্রয়োগে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

ফৌজদারি আইনের -

ফৌজদারি আইন হলো রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত এমন এক আইনব্যবস্থা, যা সমাজে সংঘটিত অপরাধসমূহ চিহ্নিত করে, অপরাধের প্রকৃতি নির্ধারণ করে এবং অপরাধীর জন্য উপযুক্ত শাস্তির বিধান প্রদান করে। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, অপরাধ দমন করা, জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

ফৌজদারি আইনে অপরাধকে কেবল ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত অন্যায় হিসেবে দেখা হয় না; বরং তা রাষ্ট্র ও সমাজের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ হিসেবেও বিবেচিত হয়। এজন্য কোনো ব্যক্তি অপরাধ করলে রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করে এবং আদালতের মাধ্যমে বিচার সম্পন্ন করে। হত্যা, চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা, দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদ, মাদক ব্যবসা এবং ধর্ষণের মতো অপরাধসমূহ ফৌজদারি আইনের আওতাভুক্ত।

ফৌজদারি আইনের মাধ্যমে অপরাধের তদন্ত, অপরাধীর বিচার, সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ এবং শাস্তি কার্যকর করার বিধান নির্ধারণ করা হয়। এর ফলে সমাজে অপরাধপ্রবণতা হ্রাস পায় এবং জনগণের মধ্যে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়।

ইসলামে ফৌজদারি আইনের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। ইসলাম অপরাধ দমন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান প্রদান করেছে।

ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা তিনটি প্রধান ধাপে পরিচালিত হয়:১)অপরাধ নির্ধারণ,২)তদন্ত ও প্রমাণ সংগ্রহ,৩)বিচার ও শাস্তি প্রদান।

আধুনিক রাষ্ট্রে ফৌজদারি বিচার সাধারণত হলো পুলিশ তদন্ত,চার্জশিট দাখিল,আদালতে বিচার,সাক্ষ্য গ্রহণ,রায় প্রদান ওশাস্তি কার্যকর।

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থায় ফৌজদারি আইন-

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থায় ফৌজদারি আইন হলো শরিয়াহভিত্তিক সেই আইনব্যবস্থা, যার মাধ্যমে অপরাধ নির্ধারণ, অপরাধের বিচার এবং অপরাধীর জন্য উপযুক্ত শাস্তির বিধান প্রদান করা হয়। ইসলামী ফৌজদারি আইনের মূল উদ্দেশ্য কেবল অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া নয়; বরং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মানুষের জীবন, সম্পদ, সম্মান ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং অপরাধ প্রবণতা প্রতিরোধ করা।

ইসলামে ফৌজদারি আইন আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এর মূলনীতি মানব-প্রণীত আইনের মতো পরিবর্তনশীল নয়; বরং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নির্ধারিত। ইসলামী আইন অনুযায়ী অপরাধ ও শাস্তির বিধান সমাজে ভারসাম্য, নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রণীত হয়েছে।আল্লাহ তাআলা বলেন:

“হে মুমিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাস ফরজ করা হয়েছে।” (সূরা আল-বাকারা: ১৭৮)

আরও বলেন:“হে বুদ্ধিমানগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।”(সূরা আল-বাকারা: ১৭৯)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:“আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তিসমূহ কার্যকর করা পৃথিবীবাসীর জন্য চল্লিশ দিনের বৃষ্টির চেয়েও অধিক কল্যাণকর।”(সুনান ইবনে মাজাহ)

*ইসলামিক ফৌজদারি আইনের প্রধান বিভাগসমূহ-

১) হুদুদ: হুদুদ হলো এমন অপরাধসমূহ, যেগুলোর শাস্তি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত এবং নির্দিষ্ট। যেমন—চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা অপবাদ, ডাকাতি ইত্যাদি।

২) কিসাস:কিসাস বলতে হত্যা বা শারীরিক ক্ষতির ক্ষেত্রে সমান প্রতিদানের বিধানকে বোঝায়। এর মাধ্যমে ভুক্তভোগীর পরিবার ন্যায়বিচার লাভের সুযোগ পায়।

৩)দিয়াত :দিয়াত হলো হত্যা বা শারীরিক ক্ষতির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদান। অনেক ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীর পরিবার কিসাসের পরিবর্তে দিয়াত গ্রহণ করতে পারে।

৪)তাআযীর: তাআযীর হলো এমন অপরাধের শাস্তি, যার নির্দিষ্ট শাস্তি কুরআন ও সুন্নাহতে উল্লেখ নেই। এ ক্ষেত্রে বিচারক অপরাধের প্রকৃতি ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে শাস্তি নির্ধারণ করেন।

*ইসলামিক ফৌজদারি আইনের বৈশিষ্ট্য

১. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।
২. অপরাধ প্রতিরোধ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
৩. অপরাধী ও ভুক্তভোগী উভয়ের অধিকার সংরক্ষণ।
৪. সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর গুরুত্বারোপ।
৫. আইনের সামনে সকলের সমতা।

ইসলামিক ফৌজদারি আইন ও আধুনিক ফৌজদারি আইনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ইসলামিক ফৌজদারি আইন এবং আধুনিক ফৌজদারি আইন উভয়ের লক্ষ্য সমাজে অপরাধ দমন হলেও তাদের ভিত্তি, দর্শন ও প্রয়োগে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান-

১. ইসলামিক ফৌজদারি আইন শরীয়াহভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ অপরাধ ও শাস্তি ব্যবস্থা, যার উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। এখানে অপরাধ শুধু সামাজিক অপরাধ নয়, বরং আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন হিসেবেও বিবেচিত।

আধুনিক ফৌজদারি আইন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত বিধানসমূহের সমষ্টি, যা সমাজে অপরাধ নির্ধারণ ও শাস্তি প্রদান করে। এটি মূলত সংবিধান, সংসদীয় আইন এবং বিচারিক নজিরের ওপর ভিত্তি করে গঠিত।

২)ইসলামে অপরাধ দুই ধরনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়: আল্লাহর হক লঙ্ঘন ও বান্দার হক লঙ্ঘন। আধুনিক আইন অপরাধ হলো রাষ্ট্রবিরোধী বা সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী কাজ। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি এখানে অনুপস্থিত।

৩) ইসলামিক ফৌজদারি আইন শাস্তি তিন ভাগে বিভক্ত হুদুদ,কিসাস,তাজির। আধুনিক ফৌজদারি আইন কারাদণ্ড,জরিমানা,প্রবেশন,মৃত্যুদণ্ড,সামাজিক পুনর্বাসন।

৪)ইসলামিক আইন ঐশী ভিত্তিক, আধুনিক আইন মানবসৃষ্ট।

৫)ইসলামে ধর্ম ও নৈতিকতা কেন্দ্রীয়, আধুনিক ব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতা।

৬)ইসলামে শাস্তি নির্ধারিত, আধুনিক ব্যবস্থায় নমনীয়।

৭)ইসলামে আখিরাতের ধারণা আছে, আধুনিক আইনে নেই।আধুনিক আইনে পুনর্বাসন বেশি গুরুত্ব পায়।

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থায় :মানবাধিকার -

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা এমন একটি পূর্ণাঙ্গ আইন ও নৈতিক কাঠামো; যেখানে মানুষের জীবন, সম্পদ, মর্যাদা, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারকে আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়। ইসলামে মানবাধিকার কোনো রাজনৈতিক ধারণা নয়; বরং এটি আল্লাহর নির্দেশিত দায়িত্ব ও ইবাদতের অংশ।ইসলামে মানবজীবন অত্যন্ত পবিত্র। অন্যায়ভাবে একজন মানুষ হত্যা করা পুরো মানবতাকে হত্যা করার সমান।আল্লাহ বলেন:

“যে কেউ কোনো প্রাণ হত্যা করল—না প্রাণের বদলে, না পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির কারণে—সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল।” (সূরা আল-মায়িদা ৩২)

ইসলামে বিচারক বা শাসককে সর্বদা ন্যায়বিচার করতে বলা হয়েছে; ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা আবেগের ঊর্ধ্বে গিয়ে।আল্লাহ বলেন:

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়বিচারের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের, পিতা-মাতা বা আত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়।” (সূরা আন-নিসা :১৩৫)

আরো বলেন:“তোমরা ন্যায়বিচার করো, তা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।” (সূরা আল-মায়িদা :৮)

ইসলাম মানুষকে সৃষ্টির মধ্যে সম্মানিত করেছে।

আল্লাহ বলেন:“নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি।” (সূরা আল-ইসরা :৭০)

ইসলামে জাতি, বর্ণ, ভাষা বা সম্পদের ভিত্তিতে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।বিদায় হজে রাসূল (সা.) বলেন:

“কোনো আরব অনারবের উপর শ্রেষ্ঠ নয়, কোনো অনারব আরবের উপর শ্রেষ্ঠ নয়; সাদা কালোর উপর শ্রেষ্ঠ নয়, শ্রেষ্ঠত্ব শুধু তাকওয়ায়।”(সহীহ হাদিস, মুসনাদ আহমদ)

ইসলামে বিচার শুধু অনুমান নয়, বরং প্রমাণের ভিত্তিতে হয়।আল্লাহ বলেন:

“তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে তা গোপন করে, তার অন্তর পাপী।” (সূরা আল-বাকারা :২৮৩)

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থায় :নারী অধিকার-

ইসলাম নারীকে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং তাকে পূর্ণ মানবিক মর্যাদা, সম্পত্তির অধিকার, বিচারিক সমতা ও নিরাপত্তা প্রদান করেছে।আল্লাহ বলেন:

“আমি তোমাদের পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি।” (সূরা আল-হুজুরাত 49:13)

ইসলামে নারী নিজের সম্পদের মালিক।আল্লাহ বলেন:

“পুরুষ যা অর্জন করে তার অংশ আছে এবং নারী যা অর্জন করে তার অংশ আছে।” (সূরা আন-নিসা 4:32)

রাসূল (সা.) বলেন:

“তোমরা নারীদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করো।” (সহীহ মুসলিম)

নারী আদালতে অভিযোগ করতে পারে, সাক্ষ্য দিতে পারে এবং ন্যায়বিচার পেতে পারে।আল্লাহ বলেন:

“ন্যায়বিচার করো, তা নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধে হলেও।” (সূরা আন-নিসা 4:135)

ইসলাম নারীর জন্য নির্ধারিত সম্পত্তির অংশ নিশ্চিত করেছে।আল্লাহ বলেন:

“পুরুষদের জন্য অংশ আছে এবং নারীদের জন্যও নির্ধারিত অংশ আছে।” (সূরা আন-নিসা 4:7)

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থায় :সংখ্যালঘুদের অধিকার

ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিক সবাই সমানভাবে নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের অধিকার পায়। ইসলাম সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।আল্লাহ বলেন:

“ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই।” (সূরা আল-বাকারা :২৫৬)

অমুসলিম নাগরিকদের জীবন ও সম্পদ ইসলামী রাষ্ট্রে সম্পূর্ণ নিরাপদ।রাসূল (সা.) বলেন:

“যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।” (সহীহ বুখারি)

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমরা “যিম্মি” হিসেবে নিরাপত্তা পায় এবং তাদের অধিকার রাষ্ট্র রক্ষা করে।আল্লাহ বলেন:

“তোমরা ন্যায়বিচার করো, তা শত্রুর বিরুদ্ধেও হোক।” (সূরা আল-মায়িদা:৮)

ইসলাম কোনো ধর্ম চাপিয়ে দেয় না।আল্লাহ বলেন:

“তুমি কি মানুষকে জোর করবে তারা ঈমান আনুক?” (সূরা ইউনুস :৯৯)

মদিনায় ইহুদি ও অন্যান্য অমুসলিমরা মুসলিমদের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করত এবং তাদের বিচারও ইসলামী আদালতে সমানভাবে হতো।

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থায়: দুর্বল ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর

ইসলাম দুর্বল, দরিদ্র, এতিম, বিধবা এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের অধিকার রক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা তাদের জন্য বিশেষ সুরক্ষা নিশ্চিত করে, যাতে সমাজে কোনো ধরনের শোষণ বা বৈষম্য না থাকে।ইসলাম দুর্বলদের অবহেলা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে।আল্লাহ বলেন:

“তুমি এতিমকে তিরস্কার করো না।” (সূরা আদ-দুহা :৯)

এতিমদের সম্পদ হরণ করা ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।আল্লাহ বলেন:

“যারা এতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা আগুন খাচ্ছে।”(সূরা আন-নিসা :১০)

ইসলামে দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হয়েছে।ইসলাম জাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে দরিদ্রদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।ইসলাম সব ধরনের শোষণ ও অন্যায়কে নিষিদ্ধ করেছে।

দুর্বল হলেও সবাই আদালতে সমান বিচার পায়।আল্লাহ বলেন:

“ন্যায়বিচার করো, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে যায়।”সূরা আন-নিসা 4:135)

সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিচার ব্যবস্থার

ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচার হলো একটি মৌলিক নীতি, যার মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি মানুষের অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা এই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রধান মাধ্যম। এটি শুধু অপরাধের শাস্তি দেয় না, বরং সমাজে ইনসাফ, সমতা ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে।ইসলাম ন্যায়বিচারকে ঈমানের অংশ হিসেবে গণ্য করেছে।আল্লাহ বলেন:

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন ন্যায়বিচার, সদাচরণ ও আত্মীয়দের অধিকার প্রদান করতে।”(সূরা আন-নাহল 16:90)

ন্যায়বিচার সমাজে ধনী-গরিব, ক্ষমতাবান-দুর্বল সকলের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করে।আল্লাহ বলেন:

“তোমরা ন্যায়বিচারের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য দাও।” (সূরা আন-নিসা 4:135)

ইসলামে শাসক ও বিচারকদের প্রধান দায়িত্ব হলো ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।ইসলাম অন্যায়, জুলুম ও বৈষম্যকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে।আল্লাহ বলেন:

“আল্লাহ জালিমদের ভালোবাসেন না।” (সূরা আলে ইমরান 3:57)

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা সমাজে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, যাতে কেউ অন্যের অধিকার হরণ করতে না পারে।ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। এটি একটি এমন সমাজ গঠন করে যেখানে আইন সবার জন্য সমান এবং কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়।

বিচার ব্যবস্থার শাস্তি

বিচার ব্যবস্থার শাস্তি বলতে সেই আইনগত ব্যবস্থা ও দণ্ডবিধানকে বোঝায়, যা অপরাধ সংঘটনের পর অপরাধীর বিরুদ্ধে আদালত কর্তৃক প্রয়োগ করা হয়। শাস্তির মূল উদ্দেশ্য হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, অপরাধ প্রতিরোধ, অপরাধীকে সংশোধন এবং সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা। একটি সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থায় শাস্তি কখনো প্রতিহিংসার মাধ্যম নয়; বরং এটি ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থায় শাস্তি

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থায় শাস্তি হলো এমন একটি আইনগত ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে অপরাধের ন্যায়সঙ্গত প্রতিকার করা হয় এবং সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইসলামে শাস্তির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র অপরাধীকে কষ্ট দেওয়া নয়; বরং অপরাধ প্রতিরোধ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, ভুক্তভোগীর অধিকার সংরক্ষণ এবং সমাজকে অপরাধমুক্ত রাখা।

ইসলামী শরিয়াহ মানুষের জীবন, সম্পদ, সম্মান, বংশধারা এবং ধর্মকে সুরক্ষিত রাখার জন্য শাস্তির বিধান প্রণয়ন করেছে। তাই ইসলামে শাস্তিকে প্রতিশোধের মাধ্যম হিসেবে

নয়, বরং ন্যায়বিচার ও সামাজিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠার একটি কার্যকর উপায় হিসেবে দেখা হয়।আল্লাহ তাআলা বলেন:

“হে মুমিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাস ফরজ করা হয়েছে।” (সূরা আল-বাকারা: ১৭৮)

কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনার আলোকে নির্ধারিত এই শাস্তি ব্যবস্থা ন্যায়বিচার, সমতা এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

*ইসলামিক বিচার ব্যবস্থায় শাস্তির প্রকারভেদ -১. হুদুদ,২. কিসাস,৩. দিয়াত,৪. তাআযীর।

ইসলামী বিচারে শাস্তির প্রদানের মূলনীতি হলো ন্যায়বিচার, সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত ওআইনের সামনে সমতা।

ইসলামী শাস্তি ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষকে শাস্তি দেওয়া কোনো চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়; বরং এটি একটি মাধ্যম—যার মাধ্যমে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা, অপরাধ প্রতিরোধ এবং মানবিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ করা হয়।

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়, সদাচার ও আত্মীয়দের অধিকার আদায়ের নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন।”(সূরা আন-নাহল ১৬:৯০)

ইসলামী শাস্তি ব্যবস্থার উদ্দেশ্যকে বিস্তৃতভাবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাগে আলোচনা করা যায়-

১)ইসলামী শাস্তি ব্যবস্থার সর্বপ্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হলো সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। এখানে বিচার ও শাস্তি কোনোভাবেই ব্যক্তিগত আবেগ, প্রতিশোধ বা পক্ষপাতিত্বের উপর নির্ভর করে না।

২) ইসলামী শাস্তি ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো অপরাধ সংঘটনের আগেই তা প্রতিরোধ করা। এই ধারণাকে আধুনিক আইনশাস্ত্রে deterrence theory বলা হয়।

৩)শাস্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা হয়। চুরি, হত্যা, সহিংসতা, প্রতারণা ও অন্যায় কমে গেলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।ইসলামী শাস্তি ব্যবস্থা এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে যেখানে:মানুষের জীবন নিরাপদ থাকে,সম্পদ সুরক্ষিত থাকে,সামাজিক অস্থিরতা কমে যায়,আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪)ইসলামে শুধু অপরাধীর শাস্তিই নয়, বরং ভুক্তভোগীর অধিকারও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

৫)ইসলামী শাস্তি ব্যবস্থার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো অপরাধীকে শুধুমাত্র শাস্তি দেওয়া নয়, বরং তাকে সংশোধন করে সমাজে ফিরিয়ে আনা।

৬)ইসলামী শাস্তি ব্যবস্থা সমাজকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করে। এটি শুধু আইন নয়, বরং একটি নৈতিক শৃঙ্খলা ব্যবস্থা।

*ইসলামী শাস্তি ব্যবস্থার কার্যকারিতা-

ইসলামী শাস্তি ব্যবস্থা শুধুমাত্র তাত্ত্বিক নয়; বরং এটি বাস্তব সমাজেও কার্যকর ভূমিকা রাখে।

১)ইসলামী শাস্তি ব্যবস্থা অপরাধে শক্তিশালী ভয় সৃষ্টি করে, যার ফলে অপরাধের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

২)প্রমাণ ছাড়া শাস্তি দেওয়া ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ফলে ভুল শাস্তির সম্ভাবনা কমে যায়।

৩)ইসলামী শাস্তি ব্যবস্থা সমাজে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে।

৪)ইসলামী শাস্তি ব্যবস্থার ফলে নৈতিক সমাজ গড়ে ওঠে,অপরাধপ্রবণতা হ্রাস পায়,আইনের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়,সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

হুদুদ আইন

“হুদুদ” শব্দের অর্থ হলো “সীমা” বা “সীমারেখা”। ইসলামী আইন অনুযায়ী, এটি সেই সীমা যা লঙ্ঘন করলে নির্ধারিত শাস্তি প্রযোজ্য হয়।হুদুদ অপরাধগুলোকে "আল্লাহর হক” হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ এগুলো ব্যক্তিগত নয় বরং সামাজিক ও ধর্মীয় শৃঙ্খলার সাথে সম্পর্কিত।

“এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, সুতরাং তোমরা তা অতিক্রম করো না।”(সূরা আল-বাকারা ২:২২৯)

*হুদুদ আইনের ভিত্তি ইসলামী শরীয়তের তিনটি প্রধান উৎসের উপর প্রতিষ্ঠিত:

ক) কুরআন;

কুরআনে কিছু অপরাধ ও তাদের শাস্তি সরাসরি উল্লেখ আছে, যেমন চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি।

“চোর পুরুষ ও চোর নারী—তাদের হাত কেটে দাও।”

(সূরা আল-মায়িদা ৫:৩৮)

খ) সুন্নাহ;

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন হাদিসের মাধ্যমে হুদুদ শাস্তির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ নিশ্চিত করেছেন।

“যদি কেউ মদ পান করে, তাকে বেত্রাঘাত করো।”

(সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

গ) ইজমা (ঐকমত্য);

ইসলামী আইনবিদগণ বহু হুদুদ বিধানে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন।

ঘ) কিয়াস;

যেসব ক্ষেত্রে সরাসরি নস নেই, সেখানে তুলনামূলক ব্যাখ্যা প্রয়োগ করা হয়, যদিও হুদুদের ক্ষেত্রে কিয়াসের সীমিত প্রয়োগ রয়েছে।

ইসলামী ফিকহ অনুযায়ী প্রধান হুদুদ অপরাধগুলো হলো:

১) চুরি,

২) ব্যভিচার ,

৩) মিথ্যা অপবাদ,

৪) মদ্যপান ,
৫) ডাকাতি/সশস্ত্র লুণ্ঠন,
৬) ধর্মত্যাগ (কিছু ফিকহ অনুযায়ী ইসলাম ত্যাগ করা)।

হুদুদ শাস্তি প্রয়োগের জন্য কঠোর শর্ত রয়েছে:
১) নিশ্চিত প্রমাণ,
২) সন্দেহমুক্ততা,
৩) জোর-জবরদস্তি না থাকা,
৪) মানসিক সুস্থতা ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া,
৫) হুদুদ আইনের উদ্দেশ্য ।

কিসাস ও দিয়াত আইন

কিসাস ও দিয়াত ইসলামি ফৌজদারি ব্যবস্থার এমন একটি অংশ, যেখানে হত্যা বা শারীরিক ক্ষতির ক্ষেত্রে শাস্তি, ক্ষতিপূরণ এবং ক্ষমার সুযোগ একসাথে বিদ্যমান। এখানে অপরাধীর শাস্তি যেমন নির্ধারিত, তেমনি ভুক্তভোগীর পরিবারের ক্ষমা করার অধিকারও স্বীকৃত।
“হে মুমিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাস নির্ধারণ করা হয়েছে।”(সূরা আল-বাকারা:১৭৮)

কিসাস অর্থ হলো “সমান প্রতিদান” বা “প্রতিশোধমূলক ন্যায়বিচার”। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি অন্যকে হত্যা করে বা গুরুতর ক্ষতি করে, তাহলে তার উপর অনুরূপ শাস্তি প্রয়োগের বিধান রয়েছে।
“জীবনের বিনিময়ে জীবন, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক।”(সূরা আল-মায়িদা ৫:৪৫)

কিসাসের মূল বৈশিষ্ট্য হলো -
১)অপরাধের সমান শাস্তি প্রদান,

২)আদালতের মাধ্যমে প্রয়োগ,
৩)ভুক্তভোগীর পরিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করে
ক্ষমার সুযোগ বিদ্যমান।

দিয়াত হলো "ক্ষতিপূরণ" বা “রক্তমূল্য”, যা হত্যা বা শারীরিক ক্ষতির বিনিময়ে প্রদান করা হয়। এটি বিশেষ করে অনিচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড বা কিসাস ক্ষমা করা হলে প্রযোজ্য হয়।
“যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করে, তার উপর দিয়াত প্রদান করা হবে।”(সূরা আন-নিসা ৪:৯২)

দিয়াতের বৈশিষ্ট্য হলো -
১)আর্থিক ক্ষতিপূরণ,
২)ভুক্তভোগীর পরিবারকে প্রদান করা হয়,
৩)সামাজিক সমঝোতা সৃষ্টি করে,
৪)ক্ষমার বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে।

কিসাসের উদ্দেশ্য হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা,হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধ,সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা,ভুক্তভোগীর অধিকার নিশ্চিত করা।
দিয়াতের উদ্দেশ্য হলো ক্ষমার,বাস্তব সুযোগ সৃষ্টি,আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান,সামাজিক দ্বন্দ্ব কমানো,পুনর্মিলন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা।
কিসাস ও দিয়াত একে অপরের বিকল্প ও পরিপূরক ব্যবস্থা ।কিসাস মূলত ন্যায় ও প্রতিশোধমূলক বিচার এবং দিয়াত হলো ক্ষমা ও সমঝোতার পথ।ইসলামে প্রতিশোধের চেয়ে ক্ষমাকে বেশি উৎসাহিত করা হয়েছে।

অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা

ইসলামী বিচার ব্যবস্থা একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ও আইনগত কাঠামো, যার মূল উদ্দেশ্য শুধু অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর শাস্তি প্রদান নয়; বরং অপরাধের মূল কারণ দূর করে সমাজে শান্তি, ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামী বিচার ব্যবস্থার প্রথম ও সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো মানুষের অন্তরের নিয়ন্ত্রণ।

ইসলাম তিনটি প্রধান ফৌজদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে অপরাধ প্রতিরোধ করে:ক) হুদুদ,খ) কিসাস,গ) তাজির।

বিচারকের বিবেচনাধীন শাস্তি, যা নতুন ধরনের অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।অপরাধের অন্যতম প্রধান কারণ হলো সামাজিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক অবিচার। ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিশোধের চেয়ে ক্ষমা ও সংশোধনকে বেশি গুরুত্ব দেয়।
“কিন্তু যে ক্ষমা করে দেয়, তার প্রতিদান আল্লাহর উপর।”(সূরা আশ-শুরা ৪২:৪০)
বিচারকের স্বাধীনতা ও ন্যায়পরায়ণতা একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা অপরাধ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।ইসলাম অপরাধ দমনে শুধু আইন নয়, বরং সমাজ সংস্কারের উপরও গুরুত্ব দেয়।ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত দোষ প্রচার না করে সংশোধনের সুযোগ দেয়।

বর্তমান মুসলিম সমাজে ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা

বর্তমান মুসলিম সমাজে ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশ, রাষ্ট্র কাঠামো এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে একরকমভাবে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রয়োগ হচ্ছে না; বরং এটি আংশিকভাবে, মিশ্রভাবে বা সীমিত পরিসরে বিদ্যমান।
কিছু মুসলিম দেশে পূর্ণ বা আংশিক শরিয়াহভিত্তিক আইন প্রয়োগ করা হলেও অধিকাংশ দেশে আধুনিক রাষ্ট্রীয় আইন ও সংবিধানভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা প্রধান হিসেবে কার্যকর রয়েছে।

বর্তমানে মুসলিম সমাজে ইসলামিক বিচার ব্যবস্থার কিছু দিক বিভিন্নভাবে প্রয়োগ হচ্ছে।অনেক মুসলিম দেশে পারিবারিক আইন (বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার) শরিয়াহভিত্তিকভাবে পরিচালিত হয়।কিছু দেশে ইসলামিক ব্যাংকিং ও আর্থিক আইন শরিয়াহ নীতির উপর ভিত্তি করে চলছে।কিছু রাষ্ট্রে শরিয়াহ আদালত বা ধর্মীয় আদালত সীমিতভাবে কার্যকর আছে। বর্তমানে মুসলিম সমাজে ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গভাবে নয়, বরং আংশিক ও মিশ্রভাবে বিদ্যমান।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত কিছু অপরাধ ও তার শাস্তি কুরআন ও হাদিসের আলোকে বর্ণনা করা হলো:

১. চুরি;

শাস্তি: নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হলে হদ অনুযায়ী হাত কাটা, অন্যথায় তাজির শাস্তি।

“চোর পুরুষ ও চোর নারী—তাদের হাত কেটে দাও।”(সূরা আল-মায়িদা ৫:৩৮)

২. ডাকাতি/সশস্ত্র ছিনতাই;

শাস্তি: হত্যা, ক্রুশবিদ্ধকরণ, হাত-পা কাটা বা নির্বাসন (অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী)।

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে।”(সূরা আল-মায়িদা ৫:৩৩)

৩. হত্যা;

শাস্তি: কিসাস, দিয়াত বা ক্ষমা।

“হে ঈমানদাররা! নিহতদের ব্যাপারে কিসাস নির্ধারিত করা হয়েছে।”(সূরা আল-বাকারা ২:১৭৮)

“রক্তক্ষয় থেকে বাঁচো।” (সহিহ বুখারি)

৪. শারীরিক আঘাত ;

শাস্তি: কিসাস বা দিয়াত।

“জীবনের বিনিময়ে জীবন।”(সূরা আল-মায়িদা ৫:৪৫)

৫. ব্যভিচার;
শাস্তি: অবিবাহিত হলে ১০০ বেত্রাঘাত, বিবাহিত হলে রজম (শর্তসাপেক্ষ)।
“ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী—তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করো।”(সূরা আন-নূর ২৪:২)

৬.অপবাদ;
শাস্তি: ৮০ বেত্রাঘাত এবং সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য।
“যারা সতী নারীদের অপবাদ দেয়... তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করো।”(সূরা আন-নূর ২৪:৪)

৭. মদ্যপান;
শাস্তি: বেত্রাঘাত (হাদিস ভিত্তিক)।
“মদ ও জুয়া শয়তানের কাজ"(সূরা আল-মায়িদা ৫:৯০)

৮. জুয়া ;
শাস্তি: তাজির (কারাদণ্ড/জরিমানা)।
“মদ ও জুয়া অপবিত্র কাজ”(সূরা আল-মায়িদা ৫:৯০)

৯. ঘুষ;
শাস্তি: তাজির + সম্পদ ফেরত।
“ঘুষদাতা ও গ্রহণকারী উভয়ের উপর আল্লাহর লানত।”(তিরমিজি)

১০. মিথ্যা সাক্ষ্য;
শাস্তি: তাজির শাস্তি।
“সবচেয়ে বড় পাপ হলো মিথ্যা সাক্ষ্য।”(সহিহ বুখারি)

১১. প্রতারণা;
শাস্তি: ক্ষতিপূরণ + তাজির।
“যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।”(সহিহ মুসলিম)

১২. বিশ্বাসভঙ্গ ;
শাস্তি: ক্ষতিপূরণ + শাস্তি।
“আমানত তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও যাদের তা প্রাপ্য।”
(সূরা আন-নিসা ৪:৫৮)

১৩. সুদ;
শাস্তি: নিষিদ্ধ + সম্পদ বাতিল + তাজির।
“আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন।”
(সূরা আল-বাকারা ২:২৭৫)

১৪. অবৈধ দখল;
শাস্তি: সম্পদ ফেরত + ক্ষতিপূরণ।
“অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ গ্রহণ করা হারাম।”(সহিহ বুখারি)

১৫. অশ্লীলতা ;
শাস্তি: তাজির।
“তোমরা অশ্লীলতার কাছেও যেও না।”(সূরা আল-ইসরা ১৭:৩২)

১৬. মাদক ব্যবসা/ব্যবহার;
শাস্তি: তাজির (কারাদণ্ড/শাস্তি)।
“যা বেশি নেশা আনে তা অল্পও হারাম।”(ইবনে মাজাহ)

১৭. রাষ্ট্রদ্রোহ;
শাস্তি: পরিস্থিতি অনুযায়ী কঠোর শাস্তি।
“যদি দুই দল মুসলমান লড়াই করে...”
(সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:৯)

১৮. ধর্মীয় অপমান;
শাস্তি: তাজির বা কঠোর শাস্তি (বিচারাধীন)।

“আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিও না।”(সূরা আল-আহযাব ৩৩:৫৭)

১৯. দুর্নীতি ;
শাস্তি: চাকরিচ্যুতি + জরিমানা + তাজির।
“তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না।”(সূরা আল-বাকারা ২:১১)

২০. মানহানি ;
শাস্তি: তাজির + সামাজিক দণ্ড।
“যারা মুমিনদের অপমান করে”(সূরা আল-আহযাব ৩৩:৫৮)

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থার বিকল্প নেই -

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটি অনন্য ও পরিপূর্ণ ন্যায়বিচার কাঠামো, যা কেবল আইন প্রয়োগের একটি পদ্ধতি নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনের অংশ। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে গঠিত এই বিচার ব্যবস্থা মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়, সমতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কাজ করে। এর মূল লক্ষ্য হলো জুলুম নির্মূল করা, অপরাধ প্রতিরোধ করা এবং মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা। এই কারণেই ইসলামিক বিচার ব্যবস্থাকে একটি আদর্শ ও ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থার সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো এর উৎস। এটি মানুষের তৈরি পরিবর্তনশীল আইন নয়; বরং আল্লাহ প্রদত্ত বিধান, যা কুরআন ও সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে এতে স্বার্থ, পক্ষপাত বা রাজনৈতিক প্রভাবের কোনো সুযোগ থাকে না।আল্লাহ তাআলা বলেন:
“তোমরা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দ্বারা বিচার করো এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।” (সূরা মায়িদাহ: ৪৯)

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক নীতি হলো আইনের সামনে সকল মানুষের সমতা। এখানে ধনী-গরিব, শাসক-শাসিত, উচ্চ-নীচ—সবাই সমান। কোনো ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান বিচারকে প্রভাবিত করতে পারে না।রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:
“তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে, কারণ তারা সম্মানিতদের অপরাধ ক্ষমা করত এবং দুর্বলদের উপর শাস্তি কার্যকর করত।” (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)
তিনি আরও বলেন:
“যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, আমি তার হাত কেটে দিতাম।” (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এর আধ্যাত্মিক দিক। এখানে বিচারক শুধু মানুষের কাছে নয়, বরং আল্লাহর কাছেও জবাবদিহি করেন। এই বিশ্বাস বিচারককে আরও সতর্ক, ন্যায়পরায়ণ ও দায়িত্বশীল করে তোলে।
“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছেন।” (সূরা হাদীদ: ৪)

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থায় শাস্তির উদ্দেশ্য প্রতিশোধ নয়; বরং অপরাধ প্রতিরোধ এবং সমাজে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কঠোর ও ন্যায়সঙ্গত শাস্তির মাধ্যমে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পায় এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।
“কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে।” (সূরা আল-বাকারা: ১৭৯)

ইসলাম মানবজীবন, সম্পদ ও সম্মানকে অত্যন্ত পবিত্র ঘোষণা করেছে। কোনো অবস্থাতেই নিরপরাধ মানুষের অধিকার লঙ্ঘনকে অনুমোদন দেয় না।
“এক মুসলমানের জীবন, সম্পদ ও সম্মান অন্য মুসলমানের জন্য হারাম।” (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থায় ঘুষ, পক্ষপাতিত্ব এবং অবিচারকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিচার প্রক্রিয়া কেবল সত্য, প্রমাণ ও ন্যায়ের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়।
“তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না।” (সূরা নিসা: ২৯)
“ঘুষ গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়ের উপর আল্লাহর অভিশাপ।” (আবু দাউদ)

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থার একটি অনন্য দিক হলো এতে কঠোর শাস্তির পাশাপাশি ক্ষমা ও সংশোধনের সুযোগও রয়েছে। এটি সমাজে ঘৃণার পরিবর্তে সহমর্মিতা ও পুনর্গঠনের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

“যে ক্ষমা করে ও সংশোধন করে, তার প্রতিদান আল্লাহর কাছে আছে।” (সূরা শুরা: ৪০)

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা শুধু অপরাধ দমন করে না; বরং মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে একটি নৈতিক সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে।

“নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।” (সূরা আনকাবুত: ৪৫)

উপসংহার

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটি পরিপূর্ণ, ভারসাম্যপূর্ণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ আইন ও বিচার কাঠামো হিসেবে বিবেচিত। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রতিষ্ঠিত এই বিচার ব্যবস্থা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, অপরাধ দমন, মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি হলো আল্লাহর নির্দেশিত বিধান, যা এটিকে মানবিক সীমাবদ্ধতা ও পরিবর্তনশীল মতবাদ থেকে স্বতন্ত্র ও স্থায়ী করেছে। এতে কোনো ব্যক্তি, শ্রেণি বা ক্ষমতার প্রভাব বিচারকে প্রভাবিত করতে পারে না; বরং ন্যায় ও সত্যই এর একমাত্র মানদণ্ড।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার করো, তখন ন্যায়বিচারসহ বিচার করো।” (সূরা আন-নিসা: ৫৮)

ইসলাম মানুষকে আইনের সামনে সম্পূর্ণ সমান মর্যাদা দিয়েছে। এখানে ধনী-গরিব, শাসক-শাসিত কিংবা শক্তিশালী-দুর্বল—সকলেই একই আইনের অধীন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনাদর্শে এই ন্যায়বিচারের বাস্তব ও জীবন্ত উদাহরণ পাওয়া যায়।

“যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, আমি তার হাত কেটে দিতাম।” (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

ইসলামিক বিচার ব্যবস্থার একটি অনন্য দিক হলো এর আধ্যাত্মিক জবাবদিহিতা, যেখানে বিচারক ও সংশ্লিষ্ট সবাই আল্লাহর সামনে দায়বদ্ধ। এই বিশ্বাস বিচার ব্যবস্থাকে কেবল বাহ্যিক নয়, বরং অন্তরের নৈতিকতার সাথে যুক্ত করে আরও শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল করে তোলে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সব কাজ দেখছেন।” (সূরা হাদীদ: ৪)